গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৮ আগস্ট - ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করার নৈতিক অধিকার নেই শাসক সিপিএমের

৩১ আগস্ট ২০০৯। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই দিনটিতেই কংগ্রেস সরকারের পুলিশ গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে খাদ্যের দাবি নিয়ে আসা লাখো মানুষের মিছিলকে রাজভবনের সামনে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে নৃশংসভাবে লাঠিপেটা করেছিল। ডেকার্স লেনের দুই মুখ আটকে মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল ৮০ জনের। আহত হয়েছিলেন কয়েক হাজার। নিখোঁজ হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। এস ইউ সি আই অফিস, অফিসের সামনে রাস্তার দু'ধারে ফুটপাথ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ভরে গিয়েছিল উদ্ধার হওয়া আহত মানুষে। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল গোটা রাজ্য। পরাধীন ভারতে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক শান্তিপূর্ণ জনসভায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে এক হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল। কিন্তু শুধু লাঠিপেটা করে যত মানুষকে ৩১ আগস্ট হতাহত করা হয়েছিল তার কোনও নজির ছিল না। তা ছাড়া এ গণহত্যা কোনও পরাধীন দেশের সরকার ঘটায়নি, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের সরকারই ঘটিয়েছিল।

কী ছিল সেদিন মিছিলের মানুষের দাবি? কেন নিরীহ, বুভুক্ষু মানুষগুলির উপর এমন অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ? আন্দোলনের পরিণতি কী হয়েছিল?

পরাধীন ভারতে কলকাতা তথা গোটা বাংলা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল; কংগ্রেসের ভিতরেই আপসমুখী ও আপসহীন ধারার মধ্যে আপসহীন বিপ্লবী ধারার প্রাণকেন্দ্র। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এখানে কখনও মাথা তুলতে পারেনি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী ধারাই ছিল বাংলায় শক্তিশালী। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়, চীনে মহান মাও সে তুঙের নেতৃত্বে বিপ্লবের অগ্রগতি, গোটা বিশ্বের সাথে এখানেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার নিয়ে আসে। ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে বামপন্থীদের প্রতি আবেগ তখন টগবগ করছে। এইরকম পরিস্থিতিতেই এল স্বাধীনতা। সরকারি ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কংগ্রেস সম্পর্কে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী মোহমুক্ত হতে থাকল। '৫৩ সালে সরকার ট্রামভাড়া বাড়ালে তা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন এক মাস ধরে চলেছিল। '৫৪ সালে শিক্ষকদের অনশন আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্র সমাজ এবং মধ্যবিত্ত জনগণ এগিয়ে এসেছিল। '৫৫ সালে পর্তুগিজ কলোনি গোয়াকে মুক্ত করার জন্য ভারত সরকার যাতে উদ্যোগ নেয়, তার দাবিতে গোয়া মুক্তি আন্দোলন রাজ্যে জোরদার হয়ে উঠেছিল। '৫৬ সালে কংগ্রেসের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে এক বছর ধরে আন্দোলন চলেছিল এবং কংগ্রেস সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। '৫৮ সালে ৭টি বড় কলেজে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

তখন প্রতিটি আন্দোলনই জঙ্গি চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি আন্দোলনই পুলিশ লাঠি-গুলি চালিয়ে দমন করতে চেয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সর্বত্রই জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সেই সময় আন্দোলনগুলিতে প্রায়ই রাস্তায় পুলিশের সাথে জনতার ব্যারিকেড ফাইট চলত। তাতে এমনকী ছাত্রীরা, মহিলারাও সামিল হতেন। তখনও স্বদেশী আন্দোলনের যুগের নৈতিকতা সমাজে অবশিষ্ট ছিল। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে প্রতিবাদী-সংগ্রামমুখী মন ছিল। এই আন্দোলনমুখী মানসিকতার জন্যই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা কলকাতা তথা এ রাজ্যকে আতঙ্কের চোখে দেখত। এই আতঙ্কই ফুটে উঠেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্যে। তিনি এ শহরকে বলেছিলেন দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিল নগরী।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই আসে '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন। স্বাধীনতার পরপরই কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের মালিক-তোষণ নীতির ফলে প্রবল খাদ্যসংকট দেখা দিল। রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। অবাধ দুর্নীতি, মজুতদারি এবং কালোবাজারির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হল আকাশছোঁয়া। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হল 'মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'। কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে শুরু হল খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে খাদ্য আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। চলল মিটিং-মিছিল-ডেপুটেশন-আইন অমান্য। কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে এস ইউ সি আই পেশ করল ১৬ দফা দাবি। এর মধ্যে অন্যতম ছিল— সস্তা দরে খাদ্য দিতে হবে, মজুতদারদের তোষণ করা চলবে না, সমস্ত মজুত উদ্ধার করতে হবে, রেশন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হবে, খাদ্যদ্রব্যের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে পাইকারি ও খুচরা উভয় স্তরে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে, সমস্ত বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বিলি করতে হবে, কৃষকদের খাজনা ও ঋণ মকুব করতে হবে, বেকারদের হয় কাজ না হয় বেকারভাতা দিতে হবে, দাবিগুলি না মানলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে প্রভৃতি। জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলা কংগ্রেস সরকার দাবিগুলি মানতে রাজি হয়নি। উপরন্তু সর্বত্রই আন্দোলনগুলির উপর নামিয়ে আনে নির্মম পুলিশি দমন-পীড়ন। বিরোধী নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করে। ১৬ আগস্ট গভীর রাতে তদানীন্তন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী ও বিধায়ক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২৭ আগস্ট ডায়মন্ডহারবারে এই আন্দোলনেরই এক প্রচারসভা থেকে কয়েকশো কৃষক সহ গ্রেফতার হন কমরেড শিবদাস ঘোষ। গ্রেফতার হন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান এবং অন্য নেতৃবৃন্দ। অন্য দলের নেতাদেরও গ্রেফতার করা হতে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা সরকার জনমনে এতটুকুও ভীতির সঞ্চার করতে পারেনি। মানুষ প্রবল উৎসাহে ৩১ আগস্টের আইন অমান্যে

সাতের পাতায় দেখুন

'৫৯ সালের ৩১ আগস্ট। পুলিশি বর্বরতার পর রাজপথে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনকারীদের মৃতদেহ।

'রাস্তা দু'দিকে আটকে মানুষের উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ কি পুলিশের আত্মরক্ষার প্রমাণ?'

'৫৯-এর বিধানসভায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী

(১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্টের প্রায় ১ মাস পর কংগ্রেস সরকার বিধানসভার অধিবেশন ডেকেছিল। অধিবেশনের প্রথম দিন ২১ সেপ্টেম্বর বিধানসভার সদস্য, এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশিষ্ট জননেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী খাদ্য আন্দোলনে কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা নিয়ে নিম্নের বক্তব্য রেখেছিলেন।)

"ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, যে ঘটনা গত কয়েকদিন ধরে হয়ে আসছে তার গুরুত্ব রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করার দরকার আছে। কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে আমার অনুরোধ, অন্ধ স্তাবকতায় প্রশ্রয় দেবেন না। পুলিশি আক্রমণের ঘটনায় যে ডেনজারাস পলিটিক্যাল ইন্ডিকেশন রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেশের চেয়ে বড় বিধানবাবু বা মন্ত্রীসভা নয় এবং গোটা দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত সেকথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ বিভাগের কেন সাহস হল এই ধরনের অত্যাচার করার? কারা এর পিছনে দাঁড়িয়ে— কোন শক্তি, কোন শ্রেণী? সরকারের যে পোটেনসিয়াল ফ্যাসিবাদী শ্রেণীচরিত্র, তা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। যারা দেশকে এবং দেশবাসীকে ভালবাসে তাদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজ রুখে দাঁড়ানো দরকার। সরকারের বক্তব্য কী? তাঁরা বলছেন, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে। আমি আপনাদের চিন্তা করতে বলি, ডেকার্স লেনে দুই দিকে পুলিশ দিয়ে আটকে মাঝে জাঁতাকলে ইঁদুর রাখার মতো রাখা মানুষদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ কি আত্মরক্ষার প্রমাণ?

দুয়ের পাতায় দেখুন

লেখক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিক্ষাবিদদের আহ্বানে

'৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণ সমাবেশ

৩১ আগস্ট, মৌলালী যুব কেন্দ্র, বিকাল ৫টা

’৫৯-এর বিধানসভায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী

একের পাতার পর

লোকে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে বাসে করে, বাস থেকে টেনে নিয়ে এসে নির্মমভাবে মারা এবং সেখানে তাকে খুন করা—এও কি আত্মরক্ষার প্রমাণ? আহত মানুষকে টালিগঞ্জ থানার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে কোল্ড ব্লাডেড ওয়েতে তার বুকে গুলি করে শেষ করে দেওয়া— এও কি আত্মরক্ষার পরিচয়? জিজ্ঞাসা করি, দাশনগরের যে ৩টি মেয়ের উপর বলাৎকার করা হল— তাও কি আত্মরক্ষার জন্য করা হয়েছে? এই সমস্ত ঘটনা কি একবারও চিন্তা করেছেন? এ আত্মরক্ষার জন্য নয়। পুলিশ পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বলা হয়েছে, জনসাধারণ হিংসাত্মক কাজ করেছে। শুনলে অবাক লাগে। গভর্নমেন্টের পুলিশ, একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ আর্মড টু দি টিথ, রিপ্রেসিভ ল’জ— একদিকে পুলিশের হাতে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র, আর একদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ— জনসাধারণ কী করে অফেন্সিভ নেবে? এ তারাই

‘‘দেশের শত্রু যারা, বিশ্বাসঘাতক যারা, তারা নিজেদের চোখ দিয়েই সকলকে দেখে, অন্যের মহত্ত্বকে, নিঃস্বার্থতাকে বোঝবার জ্ঞানবুদ্ধি তাদের নেই, বিচার করবার শক্তি নেই।’’

বলতে পারে যারা পুঁজিবাদীদের দালালি করে। যারা ধনিক শ্রেণীর দালালি করে, জনগণকে শত্রু মনে করে, তারাই বলতে পারে যে জনসাধারণ অফেনসিভ নিয়েছে, ভায়োলেন্স করেছে, তাছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। জনসাধারণ মোটেও ভায়োলেন্স করেনি, অফেনসিভ নেয়নি, নিয়েছে পুলিশ; আর জনসাধারণ আত্মরক্ষার্থে ঢিল মেরেছে, কারণ তাদের অস্ত্র বড়জোর কয়েকখানা বড় ইট। এই নিয়ে তারা পুলিশের গুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে, আর আপনারা বলছেন, জনসাধারণ আক্রমণ করেছে। জনসাধারণ ভায়োলেন্ট হয়েছে একথা যে কোন যুক্তিতে বলেন তা বোঝা যায় না। ইতিহাস অনুসন্ধান করুন— ৩১ তারিখের আগে ২৫ তারিখে হাওড়ায় কেন পুলিশ আক্রমণ করল, ২৫ তারিখে কণগাঁয় কেন পুলিশ আক্রমণ করল, ২৭ তারিখে ডায়মন্ডহারবারে কেন পুলিশ আক্রমণ করে ৩১ জনকে গুরুতরভাবে আহত করল? দেখুন, ডায়মন্ডহারবারে ১৪৪ ধারা জারি নেই, মিটিংয়ের কোনও বাধানিষেধ নেই, হাজার সুন্দরবনের চাষি সেখানে মিটিং

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী

করছে— চারদিক থেকে পুলিশ তাদের ঘিরে ধরল, নির্বিচারে লাঠি চালাল, আহত হয়ে গেল ৩১ জন লোক। যদি বলতেন যে তারা কোর্টে গিয়ে সত্যাগ্রহ করছে, তা হলে নাহয় বুঝতাম, কিন্তু সে কথা তো বলেননি। তাদের সেই সভা বেআইনিও ঘোষণা করা হয়নি, আর আপনারা বলছেন জনসাধারণ আক্রমণ করল, জনসাধারণ ভায়োলেন্ট হল। জনসাধারণ ভায়োলেন্ট হয়নি—ভায়োলেন্ট হয়েছে সরকার, ভায়োলেন্ট হয়েছে পুলিশ— জনসাধারণ আত্মরক্ষার্থে এগিয়ে গিয়েছে। আপনারা বলছেন, এই সমস্ত কাজ করেছে অসামাজিক লোক। কিন্তু এইসব অসামাজিক লোক যদি না থাকত তাহলে কালীপদবাবু (তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী— সম্পাদক গণদাবী) মন্ত্রীত্বে আসতে পারতেন না। আর বিধানবাবুকেও সারা স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ছয় মাস জেলে কাটিয়ে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব করতে হত না। এরা প্রাণ দেয় আর উপস্বত্বটুকু ভোগ করে ওই স্বার্থবাদীরা। জ্যোতিবাবু সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের একটা কথা কোট করে বলেছেন ‘সাম্রাজ্যবাদের জারজ সন্তান’। উনি অ্যাকচুয়ালি যেটা বলেছেন, তা হল — “ইহারা ব্রিটিশ শাসনের অ্যান্ডারসনী যুগের জঠর হইতে নির্গত সাম্রাজ্যবাদীদের অপজাত সন্তান। ইহারা ছিল জননীর গর্ভের লজ্জা, দেশ ও জাতির কলঙ্ক। লজ্জাও ইহাদের দেখিয়া লজ্জায় সরিয়া দাঁড়ায়। দেশবাসী ইহাদের চিনিয়া রাখে।” বটেই তো! সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দোস্তি করে যারা দেশের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অপজাত সন্তান ছাড়া আর কী? এঁরা বলেন, যাঁরা আন্দোলন করেছেন তাঁরা অ্যান্টি-সোস্যাল — অসামাজিক। অর্থাৎ তাঁরাই হলেন অসামাজিক, যাঁরা খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করে জেলে গেলেন। আর অ্যান্টিসোস্যাল হল না তারা, যারা খাদ্য নিয়ে ফাটকাবাজি করছে, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের লোককে চোরাকারবারিরা নির্মমভাবে শোষণ করছে। এরা অ্যান্টিসোস্যাল হল না, হল তারা, যারা দেশের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য জেলে আটকে রইল, যারা জনসাধারণকে খাওয়ানোর জন্য পুলিশি অত্যাচারে জর্জরিত হল। চোর যারা, দস্যু যারা, যারা অসামাজিক, যাদের কোনওরকম লজ্জা নেই, দেশের শত্রু যারা, বিশ্বাসঘাতক যারা, তারা নিজেদের চোখ দিয়েই সকলকে দেখে, অন্যের মহত্ত্বকে, নিঃস্বার্থতাকে বোঝবার জ্ঞানবুদ্ধি তাদের নেই, বিচার করবার শক্তি নেই।

এর সঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারছি না। শ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকার যদি দোষী হয়, তা হলে তার বিচার করা উচিত। তার মানে কি এই নয় যে, তাঁর মনে এ বিষয়ে সন্দেহ আছে? ‘যদি’ দোষী হয়— এ কথা কেন বললেন? এত মানুষকে যে সরকার মারতে পারে, তিনি কি তাকে দোষী মনে করেন না? তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হওয়া উচিত ছিল, যে সরকার এতগুলি লোক মেরেছে সেই সরকারের বিচার হওয়া উচিত। সে বিচার জনসাধারণ করবে। সরকার দোষী— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যে জনসাধারণ, তাদের সঙ্গে এই অত্যাচারী মন্ত্রীমণ্ডলীকে তিনি এক করে ফেলেছেন। এটা বোধহয় ঠিক হয়নি। চল্লিশজন মারা যাক আর আশিজন মারা যাক, তাকে ইকোয়েট করা হয়েছে একজন কনস্টেবলের মৃত্যুর সঙ্গে। এ জিনিস হওয়া উচিত নয়। কোনও শ্রদ্ধেয় প্রধান রাজনীতিকের পক্ষ থেকে এ জিনিস আসা সঙ্গত নয়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি। এ জিনিস তাঁর কাছ থেকে আমরা আশা করিনি।

আর একটি কথা তিনি বলেছেন, কম্প্রোমাইজ-এর কথা। যদি শর্ত তুলে নেন তা হলে আমরা কথাবার্তা বলতে পারি। ভায়োলেন্সের কথা বলা হচ্ছে। ভায়োলেন্সের চার্জ এনেছে পুলিশ। আমাদের বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ— থেফ্‌ট অব গভর্নমেন্ট প্রপার্টি। পুলিশ সত্যবাদী, এ দুর্নাম পুলিশের শত্রুও দেবে না। মিথ্যা যে পুলিশের বেসাতি, সেই পুলিশ ভায়োলেন্স আর নন-ভায়োলেন্সের কথা বলবে, এইটেই আশ্চর্যের ব্যাপার। সে-ই বলেছে জনসাধারণ ভায়োলেন্ট হয়েছিল— সেটা কেউ সত্য বলে মেনে নেবে না। ডাঃ রায় যদি কম্প্রোমাইজ চান তাহলে সকলকে— তাদের বিরুদ্ধে ভায়োলেন্সের চার্জ থাকুক আর নাই থাকুক— ছেড়ে দিন, তাহলে তখন কথাবার্তা হতে পারে। এর আগে নয়।

পিটিটিআই আন্দোলন জয়ের পথে

২১ আগস্ট বিকালে কলকাতা প্রত্যক্ষ করল সিপিএম সরকারের নির্মম বঞ্চনার শিকার ১৩ জন আত্মঘাতী সাথীর স্মৃতিতে সাদা চাদরে ঢাকা ১৩টি প্রতীকী কফিন বহন করে পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের এক মর্মস্পর্শী মিছিল। ঐ দিনই অবশ্য জানা যায়, দীর্ঘ আন্দোলনের পরিণামে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে সমস্যার একটি সমাধানসূত্র বের হতে চলেছে।

পিটিটিআই সমস্যা সমাধান না করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সরকারি বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার, পিটিটি শিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরিতে অগ্রাধিকার, আত্মঘাতী পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, নানা জেলায় পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ অন্যান্য দাবিতে ২১ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ঐ বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন দুই সহস্রাধিক পিটিটিআই ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবক সহ বহু সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ‘শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চে’র পক্ষ থেকে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, প্রাক্তন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক তরুণ নস্কর প্রমুখ বহু বিশিষ্টজন।

রাজ্যের সিপিএম সরকারের হাত ধরেই এই সমস্যার সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সংস্থা এন সি টি ই-র অনুমোদন না পাওয়ায় হাইকোর্ট রাতারাতি পিটিটিআই ডিগ্রিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবারের ৭৬ হাজার পিটিটিআই শিক্ষার্থীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। রাজ্য সরকারের তরফে সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ না দেখে চূড়ান্ত হতাশায় আত্মহত্যা করেন একে একে ১৩ জন পিটিটিআই ছাত্রছাত্রী।

কিন্তু হতাশাই শেষ কথা নয়। পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের প্রতি রাজ্য সরকারের এই নির্মম ও উদাসীন মনোভাবের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে সংগঠন ‘ওয়েস্টবেঙ্গল পিটিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন’; ঐক্যবদ্ধ ছাত্রছাত্রীরা গড়ে তুলেছেন দীর্ঘ আন্দোলন। মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, ডেপুটেশন, আইন অমান্য, ঘেরাও সহ পরিচিত সমস্ত গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করেই পিটিটিআই শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সরকারের নজরে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন বছরভর। কিন্তু সিপিএম সরকার কর্ণপাত করেনি। অবশেষে মরীয়া শিক্ষার্থীরা ৫ জুলাই থেকে কলেজ স্কোয়ারে শুরু করেন আমরণ অনশন। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ায় শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছুটে আসেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, মহাশ্বেতা দেবী, নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, চৈতালি দত্ত, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল, সুজাত ভদ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য, শুভেন্দু দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্ট গুণীজন। পাশে এসে দাঁড়ান এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার ও সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, শিক্ষার্থীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে বুদ্ধিজীবীরা ১৩ জুলাই ১২ ঘন্টার প্রতীকী অনশনেও সামিল হন। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী অনশনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে লিখিত বার্তা পাঠান।

কিন্তু এত কিছুতেও রাজ্যের সিপিএম সরকারের কোনও হেলদোল লক্ষ করা যায়নি। নেতা-মন্ত্রীদের কেউই একবারের জন্যও অনশন মঞ্চে আসেননি, বা অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করেননি। এই পরিস্থিতিতেও মনোবল অটুট রেখে অনশন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু দীর্ঘ এই অনশনের ফলে ভয়ঙ্কর শারীরিক ক্ষতি, এমনকী প্রাণহানিও ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় অনশন তুলে নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বারবার অনুরোধ জানাতে থাকেন বিশিষ্ট মানুষেরা। রাজ্যপালও একই মর্মে বার্তা পাঠান। শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা প্রতিশ্রুতি দেন, পিটিটিআই সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা লড়বেন। রাজ্যপাল জানান, তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। অবশেষে ১৪ দিন ধরে অনশন চালানোর পর রাজ্যপাল ও বুদ্ধিজীবীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অনশন তোলেন পিটিটিআই শিক্ষার্থীরা।

নতুন করে অন্য চেহারায় আবার শুরু হয় দাবি আদায়ের আন্দোলন, পথে নামেন শিক্ষার্থীরা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট গুণীজন। চলতে থাকে বিক্ষোভ আন্দোলন। এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বহুবার লিখিত আকারে এবং জিরো আওয়ারে প্রশ্ন তুলে পিটিটিআই সমস্যাটি সংসদে পেশ করেছেন। সমাধানের রাস্তা খুঁজতে একাধিকবার তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছেন। শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বলকে চিঠি লেখা হয়। এই আন্দোলনের ধারবাহিকতাতেই আয়োজন করা হয়েছিল ২১ আগস্টের মিছিলের।

মিছিলমেট্রো চ্যানেলে পৌঁছে শেষ হওয়ার পর সেখানকার বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের নেতৃবৃন্দ সহ ওয়েস্ট বেঙ্গল পিটিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সভাপতি আনন্দবরণ হাণ্ডা। এদিনই জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে চলা সংগঠিত এই আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার পিটিটিআই সমস্যা নিরসনে একটি সমাধানসূত্র বের করেছে। সংগঠনের সভাপতি জানিয়েছেন, মাধ্যমিক পাশ পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের ২ বছরের এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ শিক্ষার্থীদের ১ বছরের ‘ব্রিজ কোর্স’ করিয়ে তাঁদের ডিগ্রিকে বৈধতা দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করছে। ঐ দিন তিনি আরও জানান, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে শিক্ষক নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি ২৩ আগস্ট বেরোবার কথা ছিল এবং ১ সেপ্টেম্বর থেকে যে নিয়োগের ফর্ম বিলি করার কথা ছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে নানা সূত্রে জানা গেছে। সংবাদমাধ্যমেও এ কথার সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। পিটিটিআই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের এই জয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও পাশে দাঁড়ানো সমস্ত মানুষ সহ শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সদস্য বিশিষ্টজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দবরণ হাণ্ডা বলেন, যে সমাধানসূত্র এল, তা অবিলম্বে কার্যকর করে, পিটিটিআই শিক্ষার্থীদের যাতে এককালীন ছাড় দিয়ে অবিলম্বে নিয়োগ করা হয়, সেই দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

মুক্তিপথের সন্ধান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই দিতে পারে

৫ই আগস্টের স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(গত ৫ই আগস্ট কলকাতার নজরুল মঞ্চে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য সম্পাদিক আকারে প্রকাশ করা হল।)

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজকের এই দিনটি আমাদের সকলেরই গভীর ব্যথা বেদনার স্মৃতি বিজড়িত। আজকে এই মুহূর্তে ভারতের ১৯টি রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমরা বাইরের মাঠে এ বছর মিটিং করতে না পারায় স্বভাবতই আজকের এই সভায় প্রধানত আমাদের দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকরাই উপস্থিত হয়েছেন। আমি সমসাময়িক কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে আজ আলোচনায় যাব না, মূলত আমাদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে কিছু বিষয় রাখতে চাই। আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লিতে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আয়োজন করতে চলেছে — এ কথা আপনারা সকলেই জানেন। এও আপনার জানেন, বর্তমানে ভারতের জনজীবনে প্রবল সংকট থেকে মানুষের বিক্ষোভ এখানে সেখানে বিস্ফোরণ রূপে ফেটে পড়ছে। জনগণের পরিবর্তনের আকাঙ্খাকে পার্লামেন্টারি পার্টিগুলো নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মার্কসবাদী পার্টি হিসাবে আমরা জানি, এম এল এ - এম পি পাল্টে বা সরকার পরিবর্তনের দ্বারা জনগণের জীবনের কোনও মৌলিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। এটা একমাত্র সম্ভব বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এবং সেই দিক থেকে আমাদের পার্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নেতা-কর্মীদের সমস্ত স্তরে রাজনৈতিক সাংগঠনিক-নৈতিক সমস্ত দিক থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আরও উন্নত মান অর্জন করা দরকার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটলেও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভূতপূর্ব তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, এবং তার ফলে পশ্চিমি দেশগুলিতে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। কিন্তু তারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, যে পথের একমাত্র সন্ধান দিতে পারে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। দেশে দেশে বহু বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠছে। যারা আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলি তাঁরা জানতে, আয়ত্ত করতে ইচ্ছুক এবং সেই অর্থে আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবেও আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দুটি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক দায়িত্বের সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার জন্যই পার্টির অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য সহযোদ্ধা কমরেড নীহার মুখার্জী প্রথমে 'ত্রুটি সংশোধন ও মানোন্নয়ন' এবং পরবর্তীকালে পার্টির 'পুনরুজ্জীবন এবং সংহতিসাধন' এই দুটি অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের আহ্বান দিয়েছিলেন। যার মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে আমাদের যে সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে এবং চলছে, তারই ভিত্তিতে নতুন করে সদস্য পুনর্বীকরণ, সদস্য নির্বাচন, এগুলি চলছে। নতুন করে সেল, লোকাল, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত হবে, যাতে এই পরিস্থিতির আমরা মোকবিলা করতে পারি। এইরকম একটা সময়ে ৫ আগস্ট প্রয়াত মহান নেতা, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম এবং অমূল্য শিক্ষাগুলি থেকে আমরা যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক স্মরণ করতে পারি, যেটা আমাদের এই সংগ্রামকে যথাযথভাবে সফল হতে সাহায্য করবে, মূলত সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি কয়েকটি কথা কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে এখানে রাখতে চাই।

আমরা এই দলে অনেকেই আমাদের কৈশোরে-যৌবনে যুক্ত হয়েছিলাম। এখনও

ভাষণরত কমরেড প্রভাস ঘোষ

অনেকে যুক্ত হচ্ছেন। পার্টি এবং গণসংগঠনে নানা দায়িত্বে আছি। কিন্তু যে প্রশ্নটা আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের কাছে বারবার অত্যন্ত ব্যথা বেদনার সঙ্গে ধাক্কা দিচ্ছে, বারবার মনকে আলোড়িত করছে, সেটা হচ্ছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য যে স্বপ্ন এবং প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেটা কি সফল করতে পেরেছি? বা কে কতটা আমাদের জীবনে সফল করতে পেরেছি? এবং যদি না পেরে থাকি, কেন পারিনি এবং কীভাবে তা পারা সম্ভব? এ কি শুধু আবেগ, শুধু নিষ্ঠা, শুধু সততা থাকলেই সম্ভব? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, সততা, নিষ্ঠা, আবেগ এগুলো অবশ্যই চাই, কিন্তু শুধু তার দ্বারাই সম্ভব নয়, এর সাথে যেটা অপরিহার্য, তা হচ্ছে, সঠিক পথে, সঠিক পদ্ধতিতে নিরন্তর সর্বাত্মক সংগ্রাম, জীবনের সবদিক ব্যাপ্ত করে। আপনারা একবার স্মরণ করুন, মহান নেতার সেই কথাগুলো যা আপনাদের অনেকের বুকে গাঁথা হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, আমি যখন দল গঠন করার উদ্যোগ নিই, যাঁকেই বোঝাতে গেছি, তিনিই শুনে বলেছেন, আপনার বক্তব্য ঠিক, যুক্তি ঠিক, কিন্তু আপনি পারবেন না। এতবড় বিশাল ভারতবর্ষ, এত নামকরা নেতা, নামকরা দল, সেখানে কেউ আপনাকে চেনে না, জানে না, আপনার অর্থ নেই, লোক নেই, প্রচার নেই, এই অবস্থায় আপনি কী করবেন, আপনার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, সেদিন আমি পারব কি পারব না, এ নিয়ে তাদের সাথে তর্ক করিনি। আমি শুধু বলেছি, ধরে নিন আমি পারব না, তা হলে আমাকে কী করতে বলেন? ভারতের শোষণমুক্তির জন্য, বিপ্লবের জন্য সত্য বলে যা বুঝেছি, সেটা পরিত্যাগ করব? আমি নিজের বিবেককে বিক্রি করব, আমি গোলামি করব? যে পথ সত্য নয়, সেই পথ গ্রহণ করে যেমন-তেমন জীবন যাপন করব? এ আমি পারব না, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বলেছেন, আমি লড়ে যাব, আমাকে গুলি করে মারা যাবে, আমি না খেয়ে মরব, হয়ত আমি না খেয়ে মরছি, এই মৃত্যুর খবরও কেউ রাখবে না, কিন্তু আমি মরব মাথা উঁচু করে, কেন না আমি নিজেকে বিক্রি করিনি, আমাকে কেউ কিনতে পারেনি। আমি আদর্শ, সত্য নিয়ে লড়াই করেছি। যদি আমার এই লড়াইয়ের মধ্যে কোনও সত্য থাকে, একদিন ইতিহাস তার মূল্য দেবে। কী অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা থাকলে, সত্যর জন্য যেকোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকলে এভাবে বলা সম্ভব! এ কথাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন ১৯৪৬ থেকে পার্টি গঠনের সংগ্রামের পর্যায়ে। এই মুহূর্তে একবার সেদিনের কথা ভাবুন। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের বয়স কত! সম্ভবত ২১/২২ হবে। তিনি বলছেন, এমন দিন গেছে আমরা মাথা গোঁজার মতো একটি ঘর খুঁজে পাইনি। রাস্তায়, ফুটপাথে, পার্কে কাটিয়েছি। দিনের পর দিন অনাহারে কেটেছে। বহু শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, একটা মাদুরে অনেকে শুয়ে কাটিয়েছি যখন ঘর জুটেছে। এর বেশি আমাদের সামর্থ্য ছিল না। এই পিরিয়ডের কথা আজ এই মুহূর্তে একবার ভাবুন।

আজকে যে সিপিএমকে আপনারা দেখছেন, সেদিন এই সিপিএম-সিপিআই-নকশালপন্থীরা মিলে একটা পার্টি, অর্থাৎ অবিভক্ত সিপিআই ছিল। আজকে মানুষ সিপিএমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু সেদিন অবিভক্ত সিপিআইকে মানুষ গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাদের নেতা-কর্মীদেরও সততা, নিষ্ঠা, সংগ্রাম ছিল, আজকের মতো পচে যায়নি। ফলে, কমিউনিজমের প্রতি যারাই তখন আকৃষ্ট হয়েছে, মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তারা দলে দলে সিপিআইয়ের দিকে চলে গেছে। সিপিআই সম্পর্কে তখন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আবেগ, কারণ এই পার্টিকে সমর্থন করছে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে ভারতে তার বিরাট মর্যাদা। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, আমি মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে-তুঙকে শিক্ষক বলে গণ্য করি, কিন্তু সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এটা বোঝানো সেদিন কত কঠিন ছিল, ভেবে দেখুন। আজকের আর এস পি অত্যন্ত দুর্বল দল, সেদিন আর এস পি কিন্তু শক্তিশালী। স্বদেশী আন্দোলনে অনুশীলন সমিতি থেকে আর এস পি-র জন্ম। তাদের বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক, তারও বিরাট প্রভাব। ঠাকুর পরিবারের সৌমেন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আর সিপিআই পার্টি। আমাদের ছোটবেলায় আমরা এইসব পার্টির বিরাট মিটিং মিছিল সমাবেশ, প্রভাব প্রতিপত্তি দেখেছি। যখন আমরা কলকাতায় কমরেড শিবদাস ঘোষের স্টাডি সার্কেলে যেতাম, উপস্থিতির সংখ্যা হত ২৫-৩০ জন। কমরেড শিবদাস ঘোষ হাজরা পার্কে বলছেন, প্রায় ৩/৪ শত লোক। আর ও সব দলের সেদিন কী বিরাট মিটিং হত! এসব কথা আজ ভাবলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। সেই অবস্থায় কী কঠিন, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দুর্দমনীয় সাহস নিয়ে এবং নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে এই দলকে তিনি গঠন করেছিলেন। কী ছিল তাঁর শক্তির উৎস? তার উত্তর তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। বলেছিলেন, জানা অজানা কোটি কোটি শোষিত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, তাদের দুঃখ ব্যথা বেদনা হৃদয়কে অস্থির, অশান্ত করে তোলে, সেখান থেকে আসে কর্তব্যের আহ্বান। সেখান থেকে আসে সত্যের সন্ধান। কমরেড শিবদাস ঘোষও কৈশোরে এই উচ্চ হৃদয়বৃত্তি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তিনি আরও বলতেন, শুধু বেঁচে থেকে লাভ কী? পশু-পাখি-জন্তুরও প্রাণ আছে, তারাও জন্মায়, মারা যায়। তারাও খাদ্য সংগ্রহ করে, আশ্রয় খোঁজে ও জৈবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি করে। চিন্তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের বেঁচে থাকাও কি শুধু ভোগপ্রাচুর্য ও লোভনীয় খাদ্যসংগ্রহ, ঐশ্বর্য ও আরাম আয়েস খোঁজা আর প্রাকৃতিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি করার জন্য? নিছক এর জন্যই কি বুদ্ধিবৃত্তিকে চালনা করা? তা হলে জন্তুর চেয়ে উন্নত মানবজীবনের সার্থকতা কী? বিবেক, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, সামাজিক কর্তব্যবোধ, সভ্যতা — এগুলির কী অর্থ থাকে? তিনি বলেছিলেন, আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, যতদিন বাঁচব, আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচব, মাথা উঁচু করে, মৃত্যুও বরণ করব মাথা উঁচু করে। বলেছিলেন, মর্যাদা হারিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? বলেছিলেন, আমরা যারা মার্কসবাদী আন্দোলনে এসেছি, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ এবং তিনি নিজে, এজন্য নয় যে, তাঁরা বেকার, খাবার জোটেনি, অনাহারে কাটাচ্ছেন। বলেছিলেন, এ পথে আমরা এসেছি — উন্নত, রুচিসম্মত, উচ্চস্তরের মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনযাপন করার জন্য। একটা উন্নত স্তরের এথিক্যাল লাইফ-এর জন্য। একটা বিশেষ সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আদর্শ এবং সর্বোচ্চ যে নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতি, তাকে নিয়ে বাঁচা। সেটা না থাকলে বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। আমরা ক'জন প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের সামনে এই আদর্শকে নিয়ে চলছি? হৃদয়বৃত্তির আধার হচ্ছে কোটি কোটি জানা-অজানা মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ, যে জন্য কোনও কারণে থামা যায় না, কোনও অজুহাত দেওয়া যায় না। লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে, লড়তে লড়তেই মরতে হবে। না হলে আমার নিজের বিবেকের কাছে আমি অপরাধী হয়ে যাব। আর একটা হচ্ছে, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-মর্যাদার ভিত্তিতে জীবনযাপন করার জন্য আকুতি। এই বোধ থেকেই অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তিনি কৈশোরে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় একদিকে যেমন তিনি সামাজিক কাজ, ক্লাব, লাইব্রেরি, খেলাধূলা, ব্যায়ামাগার, জনসেবা— এইসব করেছেন। দল যেখানে যে ধরনের কঠোর কঠিন দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছেন; একই সাথে সে যুগের যাঁরা বড় মানুষ, নবজাগরণের, স্বদেশী আন্দোলন যুগের যাঁরা মনীষী, তাঁদের চরিত্র থেকে মূল্যবান সম্পদগুলি তিনি আহরণ করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, অন্যান্য বিপ্লবী, প্রত্যেকের জীবন থেকে, চরিত্র থেকে ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় যা নেওয়ার তিনি সংগ্রহ করেছেন। আমাদেরও তিনি বারবার তা নিতে বলতেন। তিনি বলতেন, আমি সবসময়ই ছাত্র। সবসময়ই শিখছি; রাস্তার লোকের থেকেও শিখি। গুণাবলী ছড়িয়ে আছে মানুষের মধ্যে। আর আমাদের বলেছেন, তোমরা সর্বহারা বিপ্লবী হতে চাও। কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবী হওয়ার আগে এ দেশের স্বদেশী আন্দোলন, নবজাগরণ ও মানবতাবাদী আন্দোলন নীতি-সংস্কৃতির যে উচ্চ মান তুলে ধরেছিল, আগে সেখান থেকে আহরণ কর, বলেছিলেন, তোমরা সর্বহারা বিপ্লবী হতে পারবে

চারের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্টের স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

না, যদি নবজাগরণ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগের চরিত্রগুলি থেকে মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ না কর, নিজের জীবনে তোমরা যদি এগুলিকে প্রয়োগ না কর। একমাত্র এই স্তর থেকে আহরণ করে, এই স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী সর্বহারা নৈতিকতার স্তরে পৌঁছনো সম্ভব। কমরেড নীহার মুখার্জী একটা আলোচনায় বলেছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ কৈশোর থেকেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেই মূল্যবোধগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগের জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। শরৎচন্দ্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, পুরনো কমরেডরা আপনারা জানেন, কতবার কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, আগে গিরীশ হও, যাদব হও, মেজদিদি হও, বিন্দু হও, নারায়ণী হও, রমেশ হও। বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুলের কাহিনী বলতে গেলে তাঁর গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে যেত। বলতেন, যদি আজকের যুগে ঘরে ঘরে ঐ রকম একটা মুর্খ বড়ভাই গোকুল থাকতেন! বলতেন, এই মূল্যবোধগুলো নিতে না পারলে তোমরা আমাকে বুঝবে না, বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করতে পারবে না। আমরা যে যেখানে আছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাকে কতটা আমরা জীবনে প্রয়োগ করছি? বিদ্যাসাগরের জীবন ও সংগ্রাম, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, সুভাষ বোস, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, এ রকম বহু বিপ্লবী, এঁদের চরিত্র ও সংগ্রামকে বাদ দিয়ে কোথাও শিবদাস ঘোষকে পাওয়া যাবে না। শরৎচন্দ্রের বই তো অনেকেই পড়ি। কিন্তু এক একটা চরিত্র থেকে কী নেওয়ার আছে, আমরা কি তা যাচাই করি? বিচার করি? কমরেড শিবদাস ঘোষ গোটা জীবনে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্বের উপরই জোর দিয়েছেন। কে কত বক্তৃতা দিতে পারে, কত লিখতে পারে, কত মিছিল করেছে, এগুলোর চেয়েও তিনি দেখতেন মানুষটা কীরকম, তার কাজকর্মে, আচার আচরণে, চরিত্রে, কী মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ ফুটে উঠছে। সমাজে কোথাও মূল্যবোধের এতটুকুও স্ফূরণ দেখা যাচ্ছে কিনা, তা তিনি আকুল হয়ে লক্ষ রাখতেন। মূল্যবোধ-সংস্কৃতির প্রতি, মনুষ্যত্বের প্রতি এই আকুলতা, কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনে একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। কমরেড শিবদাস ঘোষের কোনও আলোচনা বা বক্তৃতা পাবেন না, যেখানে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। বিদেশেও যাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পড়ছেন তাঁদের এ জিনিসটা প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান'। প্রাণহীন দেহ ফেলে রাখলে যেমন পচে যায়, একটা বিপ্লবী দলের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতি নেই, বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব নেই, তা হলে বুঝতে হবে, যতই লোকবল থাকুক, সেই দলটাও প্রাণহীন শবদেহের মতোই। তার দ্বারা উপকার হবে না, ক্ষতি হবে। বলেছেন, একটা দল বা একজন নেতা, বড় বড় আদর্শের কথা বলছে কি না, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, তার কাজকর্ম, ঘরে বাইরে আচার-আচরণে উন্নত সংস্কৃতি, উন্নত মনুষ্যত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে কি না। এই জায়গাটাই তিনি বারবার ভীষণভাবে জোর দিয়ে গেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষকে যখন বলা হত, আপনার মতো এতবড় ক্ষমতা, এত বড় যোগ্যতা, আমরা কি অর্জন করতে পারব? তিনি বিরক্ত হতেন, অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কি জান, আমি একজন গ্রাম্য কিশোর ছিলাম, আমার পড়াশুনা স্কুল পর্যন্ত, আমি কলেজের চৌকাঠেও যাইনি। সেই আমি আজ যতটুকু ক্ষমতা-যোগ্যতা অর্জন করেছি, তার সবটাই কঠিন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বলেছেন, কোনও ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা জন্মগত নয়। তা একটা সংগ্রামের ফল। একটা যুগে একটা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আদর্শ, তাকে সঠিকভাবে বুঝে, গ্রহণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই চরিত্র, ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা গড়ে ওঠে। এভাবে যে তা গড়ে ওঠে, কমরেড শিবদাস ঘোষ তার জীবন্ত প্রতিনিধি। লেনিন প্লেখানভকে পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসাবে, স্ট্যালিন পেয়েছিলেন লেনিনকে, মাও সে-তুঙ পেয়েছিলেন লি লি সান-কে। শিবদাস ঘোষের সেই অর্থে এদেশে মার্কসবাদের কোনও নামকরা শিক্ষক ছিলেন না — যাঁর সংস্পর্শে এসে তিনি শিখেছেন। তাঁর শিক্ষকরা ছিলেন বহু দূরের, তাঁদের তিনি কাছে টেনে এনেছেন, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

লেনিন পুরনো পার্টি রাশিয়ান সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির নেতা ছিলেন। মতবিরোধ হল, তিনি বেরিয়ে এলেন, আরও কিছু নেতা কর্মী নিয়ে। মাও সে-তুংও পুরনো পার্টির নেতা ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি আলাদা নেতৃত্ব গড়ে তুললেন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের এই পটভূমি ছিল না। লেনিনের সময় যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল, তার সাথে লেনিনের মতবিরোধ ঘটার তিন বছর বাদেই রাশিয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লব হয়ে গেল। এরপর লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুললেন। মাও সে-তুংয়ের সাথে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মাত্র ছয় মাসের বিরোধ ছিল, আর কমরেড শিবদাস ঘোষ সারা জীবন লড়েছেন স্ট্যালিন মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কর্তৃক স্বীকৃত সিপিআই-এর বিরুদ্ধে; যাকে তিনি মানতেন, যার পক্ষে দাঁড়িয়ে বারবার লড়েছেন, সেই আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব কিন্তু তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান।

কমরেড শিবদাস ঘোষ '৩৬ সালে অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর। '৩৮ সালে অনুশীলন সমিতিতে মার্কসবাদ নিয়ে চর্চা শুরু হয়, তখন তিনি মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেন। '৪০ সালে রামগড়ে অনুশীলন সমিতিকে মার্কসবাদী দলে পরিণত করার জন্য আর এস পি গড়ে ওঠে। তিনি তার সাথে যুক্ত ছিলেন। '৪২ সালে তিনি আগস্ট আন্দোলনে বন্দী হন। এই জেল জীবনের সংগ্রামটাই তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামপর্ব। এই জেল জীবনে শুরু হয় মার্কসবাদকে সঠিক ভাবে জানবার জন্য আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক। তিনি ইংরেজি জানতেন না। অন্যরা লেনিনের লেখার অনুবাদ করে বলছেন, কোনও কোনও সময় কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝছেন অনুবাদ ঠিক নয়। বলছেন, লেনিন এ'রকম বলতে পারেন না। প্রশ্ন উঠত, তর্ক হত। আমাদের পুরনো কমরেডরা একজনকে জানেন, তিনি প্রয়াত কমরেড শশধর ঘোষ, নীহারবাবুরা তাকে ছানাদা বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমরা অবাক হয়ে যেতাম, শিবদাস ঘোষ ইংরেজি জানেন না, অথচ লেনিনের কোনও বইয়ের বাংলা অনুবাদ শুনলে কখনও শিবদাস বলত, এটা ঠিক নয়। লেনিন এরকম বলতে পারেন না। আমরা মিলিয়ে দেখতাম, সত্যিই অনুবাদের মধ্যে ভুল আছে'।

এরপর ইংরেজি তিনি শিখলেন সরাসরি মার্কসবাদী পুস্তক পড়বার জন্য। এই জেলজীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা হল— যাঁরা মার্কসবাদ বোঝাচ্ছেন, তাঁদের জীবনে মার্কসবাদের চর্চা নেই। যিনি মার্কসবাদের ক্লাস নিচ্ছেন, তিনিই আবার পুজো করছেন। বাইরেও এ'রকম অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী দেখেছেন। এর থেকে পরবর্তীকালে তিনি বললেন, মার্কসবাদ তাঁদের কাছ থেকেই শিখবেন, যাঁরা মার্কসবাদকে জেনে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য সংগ্রাম করছেন এবং সফল হয়েছেন। যাঁরা মার্কসবাদের কথা বলেন, জীবনে তা প্রয়োগ করেন না, তাঁরা ভুল শিক্ষা দেন। এটা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর মনে ধাক্কা দিল যে, সিপিআই নেতারা, আর এস পি নেতারা, এম এন রায়ের মতো অতবড় পণ্ডিত, তাঁরা তো অনেক মার্কসবাদের বই পড়েছেন, তাঁদের তো জ্ঞানের অভাব নেই, পাণ্ডিত্যের অভাব নেই, তাহলে তাঁরা পারলেন না কেন? তাঁদের পাণ্ডিত্য আছে, সততা আছে, তাঁদের মার খাওয়া আছে, জেলে যাওয়া আছে, তা সত্ত্বেও তাঁদের এই ব্যর্থতা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, যেটা আমাদের সামনে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এঁরা মার্কসবাদকে শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে দেখেছেন, মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দর্শনগত, ভাবগত, রুচিগত সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করেই একটা জীবনদর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে হবে। এখানেই ওঁদের ব্যর্থতা। এঁদের পলিটিক্যাল লাইফ একরকম, ফ্যামিলি লাইফ আরেকরকম। এম এন রায় সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞানের, দর্শনের, জ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই, যেখানে এম এন রায় বিচরণ করেননি। লেনিনের পাশে বসেছিলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকে। সেই এম এন রায় শেষ জীবনে মার্কসবাদবিরোধী, অ্যান্টি কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন কেন? বলেছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে আহরিত যে জ্ঞান, তাকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তিনি সংযোজিত করতে পারেননি। আর না পারার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত কি না, বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক কি না, এই দিকটা বিচার করে তিনি দল, বিপ্লব ও সর্বহারা শ্রেণীর সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামটা করতে পারেননি। এখানেই এম এন রায়ের ব্যর্থতা। আমরা কি সবাই বলতে পারি, এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরন্তর মার্কসবাদকে প্রয়োগের সংগ্রাম করছি? আর এটা না করে কি কমরেড ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হওয়া সম্ভব?

আর একটা কথা তিনি বলে গেছেন। বলেছেন, মার্কস-লেনিনের বই থেকে কোটেশন আউড়ে হবে না। মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখাকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করে, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তার থেকে সাধারণ সত্যকে আহরণ করেই এসেছে মার্কসবাদী বিজ্ঞান। লেনিন মার্কস থেকে নিয়েছেন মার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতি, বিচারধারা। এই চিন্তাপদ্ধতি বা বিচারধারা হচ্ছে একটা দৃষ্টিভঙ্গি। আরও নতুন নতুন সমস্যা বিচার ও সমাধান করতে গিয়ে লেনিন মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে নতুন স্তরে উন্নত করেছিলেন। লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে, মার্কসইজম ইজ নট কমপ্লিটেড, ইনভায়োলেব্‌ল। অর্থাৎ মার্কসবাদ কমপ্লিট হয়ে যায়নি, মার্কসের সব বিচার অলঙ্ঘ্যণীয় নয়। লেনিন বলেছিলেন, মার্কস-এঙ্গেলস বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, আমাদের কাজ চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বিজ্ঞানকে সমস্ত দিকে আরও উন্নত করা, বিকশিত করা। ফলে মার্কসের মৃত্যুর পর, নতুন রূপে আসা বুর্জোয়া ভাববাদকে, বুর্জোয়া দর্শনকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ফাইট করতে গিয়ে, বুর্জোয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে ভিত্তি করে লেনিন মার্কসীয় দর্শনের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, উন্নত স্তরে উন্নীত করেছেন। লেনিন নিছক মার্কসকে 'কোট' করেননি। আবার মার্কস তাঁর সময় যা বিশ্লেষণ করেছেন, তার সাথে লেনিনের পার্থক্য ঘটে গেল। লেনিন বললেন, মার্কসের সময় পেরিয়ে পুঁজিবাদ এখন একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে বা সাম্রাজ্যবাদের যুগে পৌঁছেছে, এখন মার্কসের কিছু বিশ্লেষণ আর কার্যকরী নয়, মার্কসীয় বিজ্ঞান প্রয়োগ করেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিপ্লবের নতুন রণনীতি তুলে ধরলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, লেনিন থেকে দুটি জিনিস আমাদের নিতে হবে, যা এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্টরা নেয়নি। লেনিন থেকে আমরা নেব দ্বন্দ্বমূলক বিচারধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি যাকে তিনি আরও উন্নত করেছেন। আর বিচারধারা প্রয়োগ করে লেনিন যে বিশ্লেষণ রেখেছেন, সেগুলো আমরা জানব, বুঝব। আবার এই কাজ করতে গিয়ে লেনিন পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যা নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে তাকে ভিত্তি করে দর্শন জগতে, আদর্শগত ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জগতে যেসব বুর্জোয়া আক্রমণ হচ্ছে তাকে মোকাবিলা করে মার্কসবাদকে আরও বিকশিত করতে হবে আমাদের।

এই কাজটি করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন মাও সে-তুংয়ের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে। এটাই হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। আর একটা কথাও বলে গেছেন তিনি। যুগটা আজও লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। এই যুগে লেনিন বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এটা জেনারেল বা সাধারণ লাইন, যার সাথে দেশে দেশে বিপ্লবের বিশেষ পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। লেনিন যে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ দেখেছেন, আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ঠিক সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নেই। কোনও জিনিসই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সবই পরিবর্তনশীল। সব জিনিসের কোনও সময়ে গুণগত বা মৌলিক না হলেও, পরিমাণগত, সংখ্যাগত পরিবর্তন সব সময়ই হয়। ফলে জেনারেল গাইড লাইন একটা বিশেষ দেশে প্রয়োগ করতে গেলে একটা পার্থক্য হবে, একটা দ্বন্দ্ব ঘটবে। ফলে নকল করে হবে না। লেনিনই বলে গেছেন যে, বিপ্লবের জেনারেল লাইনকে ফ্রান্স, জার্মানি বা রাশিয়ায় একইভাবে প্রয়োগ করলে হবে না। জেনারেল লাইন সাধারণভাবে ঠিক থাকলেও তার সাথে বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব দেখা যায়, বিশেষ লাইন নির্ধারণ করতে হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষও বলেছেন, রাশিয়া চীনের নকল করে ভারতে বিপ্লব করা যাবে না। আমরা যদি শুধু কমরেড শিবদাস ঘোষের বইগুলি পড়ি আর মুখস্থ করি, তার দ্বারাই আমরা পারব না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে বিচারধারা, যে দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে আরও উন্নত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ — আমাদের সেটা গভীরভাবে অনুধাবন করে আয়ত্ত করতে হবে। বস্তুজগত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের নিয়ম আছে। পরিমাণগত পরিবর্তন আছে, গুণগত পরিবর্তন আছে। আবার পরিবর্তন ঘটে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে — আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আছে, বহির্দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্বের চরিত্র দু'রকম — বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। এ কথাগুলো বইয়ের পাতাতে আছে, সেগুলো শুধু পড়া ও মুখস্থ করা নয়। বাস্তবে চোখের সামনে দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনকে বুঝছি, বিচার করতে পারছি, ক্রিয়াশীল নিয়মকে অনুধাবন করতে পারছি, তাকে ভিত্তি করে ক্রিয়া করতে পারছি, একেই বলে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে বাস্তব পরিস্থিতিকে বোঝা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন যে, আমাদের দলেরও নেতারা এবং অধিকাংশ কর্মীরা যদি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে না পারে, বিচারধারা আয়ত্ত করতে না পারে, তা হলে কাজের অগ্রগতি ঘটবে না। তা হলে অন্ধতা আসবেই, যান্ত্রিকতা আসবেই। এইভাবে মার্কসবাদী দর্শন ও বিচারধারাকে বোঝা, জীবনের গতির মধ্যে তাকে লক্ষ্য করতে পারা, এই জায়গাটায় আমরা বহুদূর পিছিয়ে আছি। এ কথাটা আমাদের নেতা-কর্মীদের বুঝতে হবে। তিনি

পাঁচের পাতায় দেখুন

ব্যক্তিমালিকানাই আজ অর্থনীতি তথা সমাজের বিকাশের পথে অন্তরায়

৫ই আগস্টের স্মরণসভা

চারের পাতার পর

বলেছেন, ফাঁকি দিয়ে হবে না, শুধু স্লোগান দিলে হবে না। জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মানে এক, দুই, তিন, চার করে বলার মতো কিছু সূত্র নয় যে, মুখস্থ করে ফেলব। যেমন করে একজন ডাক্তার মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যাপ্লাই করেন রোগ বোঝার জন্য, যেমন করে একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের ফিল্ডে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেন বস্তুর গতি-প্রকৃতি-পরিবর্তন অনুধাবন করার জন্য, তেমন করেই আমাদেরও আমাদের ফিল্ডে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারতে হবে, তার দ্বারা সত্যকে জানতে ও বুঝতে হবে।

আর একটা কথাও তিনি বলেছেন, শুধু বই পড়লেও হবে না, শুধু কাজ করলেও হবে না। যতই বই পড়, মুখস্থ কর, মার্কস থেকে শুরু করে শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত, তাতে তুমি 'পণ্ডিত' হবে, মার্কসবাদী হবে না। আবার যতই তুমি শ্রমিক আন্দোলন কর, কৃষক আন্দোলন কর, মার খাও, জেলে যাও, প্র্যাকটিক্যাল কাজ কর, তাতেও তুমি প্রকৃত মার্কসবাদী হবে না। তিনি বলেছেন, তত্ত্ব যা বুঝেছ, সেই তত্ত্বকে কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংগ্রামকে একত্রিত করতে হবে। তত্ত্বের সাথে প্রয়োগের দ্বন্দ্ব হয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তত্ত্বের উপলব্ধি সঠিক হয়। উপলব্ধি যে সঠিক হল, তার প্রমাণ কী? তার প্রমাণ তোমার চরিত্র পাল্টে গেছে, তুমি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছ। তুমি যে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করেছ, তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি হয়েছে তোমার, তত্ত্ব এবং প্রয়োগকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তুমি সংযোজিত করতে পেরেছ— তার প্রতিফলন ঘটবে তোমার চরিত্রে।

তিনি বলেছেন, আমরা শুরু করি উন্নত মানবতাবাদীর স্তর থেকে। নবজাগরণের আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে মানবতাবাদের যে উচ্চ স্তর, তার যে সংস্কৃতি, তা দিয়েই আমরা শুরু করি। তারপর আমরা সর্বহারা বিপ্লবী তত্ত্বকে জানা ও প্রয়োগের সংগ্রাম করতে করতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোগের মধ্য দিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করি। সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত না করলে মার্কসবাদী উপলব্ধি সঠিক হয় না। আমাদের নেতারা ও কমরেডরা, আমরা ক'জন কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে জীবনে প্রয়োগ করছি? এই জায়গা বাদ দিলে আমরা কি কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হতে পারি? কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনের আর একটা দিক হচ্ছে, সত্য বলে যা উপলব্ধি করেছ, তাকে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করবে। কোথাও এতটুকু আপস নয়, কোথাও এতটুকু পিছুটান নয়। যখন তিনি সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শের সন্ধান পাননি, সেদিনও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে তিনি বাবা-মাকে ছেড়েছেন। অভাব অনটনের সংসারে তিনিই পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন। এই অবস্থাতেও তিনি বলেছিলেন, ঘরে ঘরে পথে ঘাটে কোটি কোটি বাবা-মা কাঁদছে, আমি সকলেরই সন্তান। এই বোধ নিয়েই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, রাস্তায় কোনও ভিখারি দেখলে কমরেড শিবদাস ঘোষের চোখ ছলছল করত। বৃদ্ধ ভিখারির মধ্যে তিনি তাঁর বাবা-মাকে দেখতেন এবং ভাবতেন, একমাত্র বিপ্লবের মধ্যেই এদের সকলকে বাঁচাবার সংগ্রাম রয়েছে। এর বাইরে কিছু ছিল না। কমরেড নীহার মুখার্জীর আলোচনায় আপনারা জেনেছেন যে, তাঁর স্ত্রীও প্রথম যুগে উন্নত মানের যোগ্য কমরেড ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী জীবনের কঠিন সংগ্রামের চলার পথে যখন স্ত্রী আর চলতে পারলেন না, কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাঁদের জীবনে পুত্রও এসেছিল। দলের মধ্যে অনেকেই বলেছিল, আপনার ছেলেকে একবার আনুন, আমরা দেখব। তিনি রাজি হননি। এখানে পুরনো কমরেডরা জানেন, যে কোনও কমরেডের ছোট ছেলেমেয়েরা কলকাতা অফিসে এলে কমরেড শিবদাস ঘোষ কীভাবে তাদের গভীর আবেগে তাদের কোলে তুলে আদর করতেন, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের ছেলেকে আলাদা করে দেখেননি। আদর্শ ও রাজনীতির প্রশ্নে যেখানে সম্পর্ক নেই, সেখানে স্ত্রী ও পুত্র বলে বিশেষ সম্পর্ক তাঁর ছিল না। আমরা ক'জন এভাবে লড়ছি?

কোনও কিছু 'ছাড়াকেই' তিনি ত্যাগ মনে করেননি। এখান থেকেই পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি — আমরা ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন, ব্যক্তিগত জীবন — এগুলো কেন ছেড়েছি? কারণ ওগুলোর চেয়ে অনেক মূল্যবান সম্পদ পেয়েছি বিপ্লবী জীবনে। ক্ষুদ্র কুটির ছেড়ে রাজপ্রাসাদ পেয়েছি। একটা অপমানিত গোলামির জীবন ছেড়ে পরম মর্যাদাময় জীবনে এসেছি। আমরা কোনও কিছুই ত্যাগ করিনি। কোনও কিছু না চেয়ে ছাড়াকে ত্যাগ বলে। আমরা তো বিপ্লবী জীবন চেয়েছি, সেই জন্যই যা কিছু অবিপ্লবী, তা ছেড়েছি। বলেছেন, আমাদের অভাব-অনটন-কষ্টের মধ্যে থাকা দেখে সাধারণ মানুষ মনে করেন, আমরা খুব দুঃখ-কষ্টে আছি। কিন্তু আসলে তা নয়। আপাতদৃষ্টে দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের মধ্যে একজন বিপ্লবী যে আনন্দ-শান্তি পায়, হাজার গাড়ি-বাড়ি, টাকা, আরাম-আয়েসের মধ্যে তার হদিশ পাওয়া যাবে না। তাঁরই অমূল্য উক্তি, বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের চেয়ে বড় জীবন আর কিছু হতে পারে না। আমাদের ভাবতে হবে, আমরা যা ছেড়ে এসেছি, সকলেই কি তাকে এভাবে গণ্য করতে পারছি? আনন্দ-তৃপ্তি-শান্তির সাথে আমরা কি ভাবতে পারি যে, এ জীবন আমাদের গৌরবের, মর্যাদার? কখনও কখনও ফেলে আসা জীবন কি হাতছানি দেয় না? সে জন্য কি কারও কারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে না? তা যদি থাকে, আমরা কি এগোতে পারি? জীবনকে এভাবে গ্রহণ না করে, এই মূল্যবোধ-সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে আমরা কি এগিয়ে যেতে পারি?

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও একটি গুরুতর দিক আমাদের দেখিয়ে বলেছেন, শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই নয়, বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও চীনেও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে, যেটার বিরুদ্ধে সঠিক লড়াই করতে না পারলে তা সব দেশেই বিপ্লবী আন্দোলনকে কুরে কুরে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বলেছিলেন, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙকে বিপ্লবের সময় এই বিপদের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমরা জানি, সামন্ততান্ত্রিক অ্যাবসোলিউট মালিকানাকে ভেঙে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে লড়াই, তার স্লোগান ছিল, ব্যক্তি মাত্রই সম্পত্তির মালিক হতে পারে। এটা ছিল সে যুগে উৎপাদনের অগ্রগতির স্লোগান। এ না হলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথা ও কুটির শিল্প ভেঙে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উৎপাদন আসত না, উৎপাদনের অগ্রগতি হত না। ফলে তখন ব্যক্তি মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমাজ অগ্রগতির সংগ্রাম ছিল। অর্থনৈতিক কাঠামোতে একে ভিত্তি করে সুপারস্ট্রাকচার বা 'উপরিকাঠামো'তে, নবজাগরণের যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান এসেছিল যাতে ব্যক্তি সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ প্রগতির জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমাদের দেশে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদই উন্নত মানুষের সৃষ্টি করেছিল। কারণ তখন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজবিপ্লবের পরিপূরক ছিল। একে ভিত্তি করেই বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এসেছিল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পরবর্তীকালে বিশেষত পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে পৌঁছনোর পর ব্যক্তিমালিকানাই অর্থনীতির বিকাশের পথে, সমাজ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সর্বোচ্চ লাভ এবং সেই সর্বোচ্চ লাভের জন্য সর্বোচ্চ লুণ্ঠন-শোষণ, তার থেকেই আসে কলকারখানা বন্ধ হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই। শ্রমিক না খেয়ে মরুক, মালিকের কিছু যায় আসে না, তাকে লাভ করতেই হবে। উৎপাদনে ব্যক্তিমালিকানার এই পরিণতি। যুদ্ধ, অন্য দেশের ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন, গণতন্ত্র হত্যা — এ সবই ব্যক্তিগত মালিকানার মুনাফার স্বার্থকে ভিত্তি করে ঘটছে। এই ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থা থেকেই এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তির চরম স্বার্থপরতা। এর ফলেই পুরনো বুর্জোয়া মানবতাবাদ আজ আর সমাজপ্রগতিতে কাজ করছে না। কারণ, মানবতাবাদের সর্বোচ্চ স্লোগানই ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার। এর থেকে ইতিহাসের গতিপথে এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা — যেখানে কোনও সামাজিক দায়-দায়িত্ব নেই, কর্তব্যবোধ নেই। এই ব্যক্তিবাদের ভয়ানক রূপ আজ শুধু সমাজ নয়, পরিবারকেও ভাঙছে। সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখে না। স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ সম্পর্ক নেই। অপত্য স্নেহ নষ্ট হচ্ছে। সর্বত্রই শুধু স্বার্থপরতা, ভোগসর্বস্বতা, রুচিহীনতা। এই যে কুৎসিত ব্যক্তিবাদ সমাজ পরিবেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তার প্রভাবে গণআন্দোলন ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন। গভীর উদ্বেগে কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন, রাশিয়ার পার্টি, চীনের পার্টির সামনে ব্যক্তিবাদ এত গুরুতর সমস্যা নিয়ে ছিল না। তাদের এদিকটা নিয়ে অত ভাবতে হয়নি। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থে খুবই অনুন্নত রাশিয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণী ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। সেই অর্থে নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও, কৃষিতে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কনটেন্ট ছিল। আর চীনে তো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল। ফলে বিপ্লবের সময় দুইটি দেশেই বুর্জোয়া মানবতাবাদ, ব্যক্তিবাদ আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল ছিল।

কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষকে ভাবতে হয়েছে। রাশিয়ার পার্টিতে, চীনের পার্টিতে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান হিসাবে ছিল — বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের সময় বললেন, চরিত্রের এই মান সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যাঁরা উর্ধ্বতন নেতা হবেন, তাঁদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তিই নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ ও মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। আমার পরিবার, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার নাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভালো লাগা, মন্দ লাগা — এই যে সব ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার থেকে মুক্ত হয়ে সব ক্ষেত্রেই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবনে গ্রহণ করে বিপ্লব ও দলের সাথে একাত্ম হতে হবে, না হলে আজকের দিনে বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এটা দল গঠনের পর্বে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি অমূল্য শিক্ষা, যেটা বর্তমান যুগে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির যুগে শুধু আমাদের দেশের সামনেই নয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনেও তিনি উপস্থিত করেছেন। আমাদের সকলের জীবনেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সংগ্রাম। আমাদের দলের যাঁরা হোলটাইমার, যাঁরা চাকরিতে যাননি, যাঁরা বাড়ি ছেড়েছেন, যাঁরা দলের যেকোনও ডাকে দায়িত্ব নিয়ে যান, তাঁদেরও যে জায়গাটায় আটকাচ্ছে, তা হল, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি-দাম্পত্য বা কর্মীতে-কর্মীতে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ এক বিরাট অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। এদিকটা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার দেখিয়েছেন। একে বাদ দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে বোঝার উপায় নেই।

আমরা কোথায় আটকে গেছি? কমরেড শিবদাস ঘোষকে ঘিরে আমাদের যথেষ্ট আবেগ আছে, আমাদের স্বপ্ন কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হয়ে গড়ে ওঠা। কিন্তু নবজাগরণের অধ্যায়ের, স্বদেশি যুগের, বা শরৎসাহিত্যের উন্নত চরিত্রগুলি থেকে যেভাবে তিনি আহরণ করতে বলেছেন, সেই আহরণের সংগ্রামে আমরা পূর্ণভাবে যুক্ত হতে পারিনি। আংশিক, খণ্ডিত সংগ্রাম করছি কখনও কখনও। আমরা আটকে গেছি কোথায়? সত্য বলে যা বুঝি, তাকে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নিরন্তর সর্বাত্মক সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা বহু পিছিয়ে আছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, দলের খাতায় নাম থাকলেই কেউ মার্কসবাদী হয় না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারধারা, রুচি-সংস্কৃতি, অভ্যাস-আচরণ, এই পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই আমরা পেয়েছি। আমাদের জন্ম ১৯৩০ বা ১৯২৫ সালে নয়, যখন ভারতবর্ষে ব্যক্তিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল; সমাজে মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। আমরা জন্মেছি এমন সময়ে, যখন ভারতবর্ষ পচে গেছে, কুৎসিত ব্যক্তিবাদ সমাজ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহে-মনে তার ছাপ ফেলছে, প্রভাব বাড়ছে। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, যদি বিরামহীনভাবে না লড়ো, সর্বদা যদি না লড়ো, তাহলে তোমার পতন হবে। বলছেন, তুমি যখন নানা দাবিতে লড়াই করছ, লড়াইয়ের আবেগে টগবগ করছ, তখনও তোমার অজান্তে, তোমার ভেতরে পচা-গলা বুর্জোয়া সংস্কৃতি ঢুকছে — কখনও হতাশার রূপে, কখনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিভ্রান্তির রূপে, কখনও প্রিয়জনের চোখের জল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে, তুমি টেরও পাচ্ছ না। এজন্যই তিনি বলতেন, সবসময় সজাগ থাকবে। তোমার যে কোনও চিন্তা, আচরণ, আবেগ, সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ-অভিমান — সব কিছুরই শ্রেণীচরিত্র আছে। হয় তা বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, না হয় সর্বহারা সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কমরেড ঘোষ বলছেন, প্রতি মুহূর্তে বিরামহীনভাবে আমি যদি নিজের ক্ষেত্রে সচেতন না থাকি, তবে এখান থেকে আমারও ক্ষতি শুরু হবে। একবার ভেবে দেখুন, তাঁর মতো মানুষও নিজের ক্ষেত্রে কত সতর্ক ছিলেন। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম আরও কত জরুরি। রোগের ক্ষেত্রে যেমন লড়তে হয়, তেমন বিষাক্ত সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও লড়তে হয়। কিন্তু আমরা অধিকাংশ নেতা-কর্মীরা সেই লড়াই করছি কি? অনেকে তাদের পরিবারকে পার্টির সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন। এটা তো ভাল কাজই। কিন্তু আমার যে ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা দলের সাথে যুক্ত, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক কি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে? নাকি এখানে কনভেনশনাল বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ ধাক্কা দিচ্ছে? আমি কি স্ত্রী-স্বামী-সন্তানকে কমরেড হিসাবে বিচার করছি, নাকি পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রচলিত আবেগের ভিত্তিতে বিচার করছি? অথবা দুটোরই সংমিশ্রণে বিচার করছি? জেনে বা না জেনে, প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও এই সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে প্রভাবিত করছে। এগুলি কিন্তু আজকে দলের অভ্যন্তরে সমস্যা। এটা ভাল লক্ষণ যে, বহু কমরেডই কমরেড মহান নেতার শিক্ষা অনুযায়ী

ছয়ের পাতায় দেখুন

কালেকটিভের মধ্যে থেকেই বুঝতে হবে কোনটা ব্যক্তিবাদী ঝোঁক

পাঁচের পাতার পর

পরিবারকে দলের সাথে যুক্ত করছেন, করার জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পার্টির ভিতরেই পরিবারটি ও পার্টির মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। এমনকী সেন্টারেও যাঁরা থাকেন, সেখানেও খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, সম্পর্কের মধ্যে কনভেনশনাল পারিবারিক অ্যাপ্রোচ ধাক্কা দিচ্ছে। পার্টিজীবনে স্ত্রী যে কথা স্বামীকে বলতে পারে না, স্বামী যে কথা স্ত্রীকে বলতে পারে না, পার্টির যে সব কথা সন্তানের শুনতে নেই, যেগুলি একমাত্র ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের জানার কথা, সে সব ক্ষেত্রে অনেক পুরনো কমরেডদেরও গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করছি না। তিনি বলেছেন, স্নেহ-মায়া-মমতা এগুলো মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বলেছেন, ভালবাসাই তো আমাদের এই পথে এনেছে। কিন্তু সেই ভালবাসা হবে আদর্শভিত্তিক, রুচি-সংস্কৃতিভিত্তিক। স্নেহ-প্রেম-প্রীতিরও শ্রেণীচরিত্র আছে। সর্বহারা বিপ্লবীর ক্ষেত্রে ভালবাসা শক্তি দেয়, দুর্বল করে না। যেখানে তা দুর্বল করে, আমি বুঝি বা না বুঝি, সেখানে কোথাও না কোথাও প্রচলিত বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ কাজ করছেই। এক্ষেত্রে আমার ক্ষতি অনিবার্য। যুক্তি-তর্ক-আলোচনার প্রভাব থাকেই। কিন্তু স্নেহ-মমতা-আদর-অভিমান এগুলির প্রভাব অনেক বেশি। আদর্শ ও রুচিভিত্তিক হলে তা মানুষকে বড় করে। না হলে চরম ক্ষতি করে। স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে মানুষের রুচি পাল্টায়, এমনকী বিচারধারাও পাল্টায়। ফলে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-পিতা-মাতা বলে নয়, যার মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ দেখব, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি দেখব, তাকেই কমরেড হিসাবে শ্রদ্ধা করব। কমরেডদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও আসে। সেখানে বিচার করব কী দিয়ে? বিচার যদি হয় বাইরের স্লোগানের চাকচিক্য দেখে, বক্তৃতার বহর দেখে, তাহলে ভুল হয়। এ জন্যই নেতাদের সাথে বিচার মিলিয়ে নিতে হয়। নিজে নিজে ঠিক করেছি — এখানেই ক্ষতি। তাই সঠিক বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। আবার কালকের ভালবাসার পাত্রপাত্রী বা সন্তান, আগের জায়গায় নেই, পতন হচ্ছে, কিন্তু অন্ধ স্নেহে তা বুঝি না, না হয় বুঝেও দুর্বলতার জন্য তার বিরুদ্ধে লড়ছি না। এর থেকে ক্ষতি অনিবার্য। একটি শিশুকে আদর করছি। সে আমার গর্ভজাত, আমার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক, এজন্যই তাকে আদর করছি, নাকি যে কোনও শিশুকেই আমি আগামী দিনের সম্পদ হিসাবে আদর করি? সমগ্র পুরুষজাতির প্রতি আমার মমতার বিশেষ প্রকাশই হচ্ছে আমার প্রেমিক বা স্বামীর প্রতি মমতা। একইভাবে, নারীজাতির প্রতি ভালবাসাই বিশেষ রূপে আসে একটি বিশেষ নারীর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে। এবং সব ক্ষেত্রেই সেটা গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। আমরা যে যত্ন করি, আদর করি — এগুলো হচ্ছে, শুধু মানসিক নয়, এক ধরনের ফিজিক্যাল তৃপ্তিও। যেমন মায়ের কোলে মাথা দিই, মা আদর করে। আমিও আনন্দ পাই, মা-ও পায়। একধরনের স্নায়বিক ও মানসিক তৃপ্তি ঘটে। শিশুকেও একইভাবে আদর করি, বাবাকে জড়িয়ে ধরি; ভাইবোনকে, বন্ধুকে আদর করি। উভয়েই দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি পাই। নরনারীর দৈহিক সম্পর্কও যদি শুধু ফিজিক্যাল ইম্পাল্‌স হয়, আমার জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না হয়, যেটা জন্তুজগতেও চলে, তাহলে এর মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়? এই তাড়না কন্ট্রোল করতে পারিনি, তার জন্য দৈহিক সম্পর্ক এসেছে, এর মধ্যে উন্নত কী আছে? আর একটা হচ্ছে, একজনের আচার-ব্যবহার, মনুষ্যত্ব, মর্যাদা, ক্রিয়াকর্ম অনেক উঁচু দরের। এজন্য তাকে শ্রদ্ধা করি। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভিত্তি করে দৈহিক সম্পর্কও আসতে পারে, কিন্তু দৈহিক তাড়নায় আমি তাকে ভালবাসিনি। বড় চরিত্রের জন্য ভালোবেসেছি। সেই পথেই দৈহিক সম্পর্ক এসে গেছে। ফলে, শুধু আমার মনই নয়, আমার দেহটা, দৈহিক সম্পর্কও, উন্নত আদর্শের জন্য, বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত। উপলব্ধি আমার এমন স্তরের যে, আমার মন, দেহ সবকিছুই বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। সম্পর্কটা যেখানে এরকম নয়, আমার আবেগ স্বামী বলেই, স্ত্রী বলেই, ভাই বলেই, সেখানে উন্নত চরিত্রের কী আছে? তাই কমরেড ঘোষ বলেছেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেক বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ট্রটস্কি, লিউ শাও-চি, এম এন রায়। এঁদের জীবনেও কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও আপস থাকার ফলেই তাঁদের ক্ষতি হল, পতন ঘটল। এগুলো অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি না। কমরেড শিবদাস ঘোষ যতদিন বেঁচে ছিলেন, দলের অভ্যন্তরে তিনি এ নিয়ে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, নিজেকে জাহির করা এবং অপরকে ছোট প্রমাণ করা হচ্ছে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। বলেছেন, কারও ত্রুটি খুঁজো না। দলের ভিতরে বা বাইরে তোমার চোখ-কান-মন সর্বদা খুঁজবে কার থেকে কী শেখার আছে, অপরের গুণ কী আছে। আর খুঁজবে কোথায় তোমার ত্রুটি। কোথায় তুমি পিছিয়ে আছ। যে এগোতে চায়, এভাবেই সে খোঁজে। এগোনো মানে বড় হওয়া, অর্থাৎ ক্রমাগত ত্রুটিমুক্ত হওয়া। আমরা কতজন নেতা-কর্মী এভাবে তাঁর শিক্ষাকে জীবনে রূপায়ণ করার জন্য লড়াই করছি? তাঁরই শিক্ষা হচ্ছে, কোনও কমরেড সম্পর্কে নিজে একা একা কোনও সিদ্ধান্ত নিও না। যদি সচেতন ভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বহারা সংস্কৃতি প্রয়োগ করে বিচার করতে না পারো তাহলে যত বছরই পার্টি করো আর যে স্তরেরই নেতা হও, অজানিত ভাবে হলেও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যাবে। এই শিক্ষা তো আমরা জানি অনেকেই, কিন্তু ক'জন সতর্ক আছি? কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক নিজে বলেছেন, কারও সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা সঠিক কি না, সেটা তিনি আলোচনা করে বুঝে নিতেন। কিন্তু আমরা আকছার কমরেডদের সম্পর্কে 'এ খুব খারাপ', 'ও খুব ভাল' — এসব ব্যক্তিগত রিডিং নিয়ে থাকি। দলের সাথে আলোচনা করে ঠিক করি না। এই হচ্ছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, কেউ সমালোচনা করলে তার মধ্যে মূল্যবান কী আছে, নেওয়ার মতো কী আছে, সেটা আগে বিচার করো, তারপর সমালোচনার মধ্যে বদ মতলব কিছু থাকলে দেখবে। তিনি শুধু আমাদের জন্য এটা বলেননি। তিনি নিজে সারা জীবন সকলের থেকে শিখতেন। এমনকী অন্য দলের নেতাদের গুণাবলী নিয়েও আলোচনা করতেন। আমরা বিস্মিত হতাম। তিনি বলতেন, অপরের ত্রুটি নিয়ে খোঁচাখুঁচি কোরো না, তার গুণাবলী বাড়িয়ে তাকে ত্রুটিমুক্ত হতে সাহায্য করো। জুনিয়র কর্মীরা অন্যায় করলে, ভুল করলে, আচরণ কখনও বিরক্তিকর হলেও নেতাদের বলেছেন, রেগে যেও না, বকাবকি কোরো না। উনি নিজে তা করতেন না। বলেছেন, আমার এই অসুস্থ শরীর, কখনও হয়ত উল্টোপাল্টা আচরণ দেখলে বিরক্ত হই, কিন্তু তবুও আমি বকাবকি করি না। আমার উদ্দেশ্য তাকে যত্নের সাথে, স্নেহের সাথে বুঝিয়ে ত্রুটিটা দূর করা। বকাঝকা করলে সত্য কথাও মিথ্যা হয়ে যায়। আবার যাকে মেরে বকে বোঝানো যায়, তাকে তাই করবে। যে তোমার বকার মর্যাদা দেবে, মারের মর্যাদা দেবে, সেখানে তা করা যায়। যেমন আমাদের বাবা-মা'রা করতেন। আগে তো কর্মীদের কাছে বাবা-মা তুল্য স্থানে অধিষ্ঠিত হই, তারপর ত এই অধিকার অর্জন হবে। কোনও কমিটির নেতা হলেই কি তৎক্ষণাৎ তা হওয়া যায়? অনেক কঠোর সংগ্রাম করে, অনেক উন্নত মান অর্জন করে 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে' এসবের মধ্য দিয়েই ঐ অধিকার অর্জন করতে হয়। আমাদের জীবনে আমরা এ সব কতটুকু করতে পারছি? তিনি বলেছেন, আমি কত বড়, আমি কত জানি, এ সব ভাববে না। তোমার যদি বড়ত্ব থাকে, তবে যারা উন্নত মনের লোক, গুণের কদর বোঝে, তারা তোমাকে বুঝবে। তিনি বলেছেন, আমি কিন্তু কোনওদিন নেতা হওয়ার কথা ভাবিনি। আমি যাদের নেতৃত্বে কাজ করেছি, তারা কেন নেতা, আমি কেন নেতা নই, এ সব আমার চিন্তার বিষয়ই ছিল না। আমি বিপ্লবের জন্য কাজ করতে এসেছি। এভাবে কাজ করতে করতে আমি কখন যে তাদের নেতা হয়ে গিয়েছি, তারা আমাকে নেতা বলে মানছে, আমিও বুঝতে পারিনি, তারাও বুঝতে পারেনি। কোনও আইন করে, কোনও সিদ্ধান্ত করে এ জিনিস হয়নি। আপনার থেকেই হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, আমি কোনওদিন নেতা হতে চাইনি বলেই আজ হয়ত আমি নেতা হয়েছি। এও আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমাদের কমরেডদের মধ্যে একদল আজও গাড়ি-বাড়ি টাকা-পয়সার মোহ, সন্তানের মোহ ছাড়তে পারেননি। তাঁরা দলকে সাহায্য দেন, দল চাইলে দেন। অনেকে না চাইলেও দেন, আবার অনেকে হিসাব করে দেন। এই হিসাবি মন কি সর্বহারা সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? অথচ ছেলেমেয়েদের ডিগ্রি, স্ট্যাটাস ইত্যাদির জন্য তাঁদের বেহিসাবি টাকা খরচ করতে আটকায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দুঃখ-ব্যথা, সুবিচার-অবিচার, সাফল্য-পরাজয় সবই থাকে। এমনকী ষড়যন্ত্রও থাকে। কাউকে ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটতে পারে। তখন সেই কমরেড কী করবে? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, তুমি যদি সত্যিকারের বিপ্লবী হও, তাহলে এখানে সেখানে বিক্ষোভ করবে না, দলের বাইরে থেকে তুমি কাজ করবে বিপ্লবের জন্য। সঠিক বিপ্লবী দল হলে নিশ্চয় পুনরায় তোমাকে স্থান দেবে। এটাই হচ্ছে ইমপার্সোনাল অ্যাপ্রোচ। দলের স্তরে স্তরে কমিটির পরিবর্তন হয় এবং হবে। কোনও কমরেড হয়ত উচ্চতর কমিটি থেকে নিচের কমিটিতে আসবে, সদস্য থেকে আবেদনকারী সদস্য হবে, হয়ত তাও থাকবে না। এর বিচার সঠিক হতে পারে, ভুলও হতে পারে। মাও সে-তুং বলেছেন, আমাকে বহু সময় নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে আমি উপকৃতই হয়েছি। আমার দৃঢ়তা আরও বেড়েছে, বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা বেড়েছে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিপ্লবীর সব সময়েই মনে শান্তি, আনন্দ রক্ষা করতে হয়। আমরা খাই না খাই, আমাদের চোখ তো জ্বলজ্বল করবে। বিপ্লবী হিসাবে আমরা মানব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ কাজ করছি, আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অভাব-অনটন থাকলেও আনন্দেই কর্তব্য করছি, না হলে কাজে প্রাণ থাকে না। আমাদের পার্টির ভিতরে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, আমাদের আদর্শ সঠিক, সর্বহারা সংস্কৃতির মহৎ দৃষ্টান্তও সামনে আছে। আবার দলের অভ্যন্তরে বাইরের থেকে অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রবল বেগে নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করছে। আগে যাঁদের যা স্ট্যান্ডার্ড ছিল, তাঁরা তা রক্ষা করতে পারছেন না। যার ফলেই আমাদের সংখ্যাগত শক্তি যত বাড়ছে, গুণগত শক্তি সেই অনুযায়ী বাড়ছে না। এটা বাড়লে দলের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে।

৫ই আগস্টের স্মরণসভা

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তিবাদী ঝোঁককে ফাইট করতে হলে, কালেকটিভের মধ্যে থেকে, কমিটির মধ্যে থেকে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে থেকে আমাকে বুঝতে হবে, কোনটা আমার ব্যক্তিবাদী চিন্তা-আচরণ। শুধু বই পড়ে হবে না। কালেকটিভের মধ্যে থেকে লড়াই করে আমাকে আয়ত্ত করতে হবে। আমরা কি সবাই তা করছি? বলেছেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করে কালেকটিভ গড়ে ওঠে। আবার এই কালেকটিভের নেতৃত্বে ব্যক্তির উদ্যোগ গড়ে ওঠে। নেতাদের, কর্মীদের বলেছেন, সব সময় জনগণের মধ্যে থাকবে, গভীর ভালবাসা মমতা নিয়ে থাকবে। শুধু কাগজ বিক্রি আর চাঁদা তোলার জন্য যাওয়া নয়। জনগণের সমস্যা, ব্যথা-বেদনা বোঝো। তাহলেই তোমার হৃদয়বৃত্তি ঠিক থাকবে। অফিসে, সেন্টারে বসে থাকলে হৃদয়বৃত্তি থাকে না। অসংখ্য হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের সংযোগ চাই, এ নিয়েই হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া চলে। অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষের কাছে যত বেশি সম্ভব যাও। বিপ্লবী হিসাবে তাদের কাছে যাও। উন্নত সংস্কৃতি নিয়ে যাও। আবার তাদের দুঃখ-ব্যথা-বেদনা এগুলো অনুভব কর হৃদয় দিয়ে। আবার তোমার আচার-আচরণ-সংস্কৃতির প্রভাব জনগণের মধ্যে ফেলো। সমাজের মধ্যে তা যেতে থাকে। একদিকে প্রচার, পাবলিক টক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে, পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে যে কোনও কথাই হোক, যে কোনও প্রশ্ন উঠুক, পার্টির শিক্ষা থেকে তার উত্তর দাও। ভুল হয় হোক। উত্তর দেবার চেষ্টা কর। এর থেকে শিখবে। ভাল প্রোপাগান্ডিস্ট হও। শিববাবু বলেছেন, বিপ্লবই একমাত্র যার ধ্যানজ্ঞান, সেই ভাল বক্তা হয়, প্রোপাগান্ডিস্ট হয়। শিববাবু বলেছেন, কালকে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি, তোমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছ, আর আমি আজ ভাবছি— এই বক্তৃতা আরও কত উন্নত করা যেত। আর আমরা? একটু হাততালি পেলেই মাথা খারাপ করি। ফলে বলেছেন, আলাপ আলোচনা কর, ভাবো আরও কত ভাল করা যায়। যে কোনও কাজ, তাকে শিল্পের মতো গ্রহণ কর। সৃজনশীল মন নিয়ে কর। একটা পোস্টার যখন লিখছ, সেটা একটা শিল্প, ওয়ালিং যখন করছ, একটা কাগজ যখন বিক্রি করছ, তখন তুমি শিল্পী। কালেকশন যখন করছ, তখন তুমি শিল্পী। তোমার সৃজনশীলতা চাই। তা হলে কাজের মধ্যে প্রাণ থাকে। বলছেন, ঘর ঝাঁট দিচ্ছ যখন, তখন যেন লোক তাকিয়ে দেখে। তোমার শৃঙ্খলা, তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা। এর মধ্য দিয়ে ক্যারেকটার গড়ে ওঠে। বলছেন, কোনও কাজই ছোট নয়। ছোট ছোট কাজ দিয়েই বড় কাজ হবে। পুরনো দিনের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে বলছেন, বড় যদি হতে চাও প্রথমে ছোট হও তবে। মানে, কোনও কাজকে ছোট বলে অবজ্ঞা কোর না। আর একটা কথা বলেছেন, যে সত্যিকারের বড়, সে ছোটর অধীনেও কাজ করতে পারে। তার কাছে বড়-ছোট ভেদ নেই। কাজটাই তার মূল কথা। ফলে কর্মীদের বলেছেন, জনগণের কাছে যাও; ক্লাব, লাইব্রেরি, সংগীত গোষ্ঠী, সাহিত্য গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, খেলাধূলা, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই যাও, নেতৃত্ব দাও। আন্দোলন গড়ে তোল। আর সব কাজের মধ্য দিয়ে আলোচনার ছলে, গল্পের ছলে বিপ্লবী রাজনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে যাও। এগুলো চাই। ফলে শুধু রুটিন ওয়ার্কের দ্বারা হবে না। মাস-লাইফ চাই, মাস-স্ট্যাগল চাই, মাস অরগানাইজেশন চাই। এবং তার মধ্যে থেকেই দলের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির চর্চা করার সংগ্রাম চাই। একথাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন।

কমরেডস, আজ পার্টি দ্বিতীয় কংগ্রেস করতে চলেছে। কমরেড নীহার মুখার্জী আহ্বান করেছেন

আটের পাতায় দেখুন

সেদিন আন্দোলনের মধ্যে ভোটসর্বস্ব ও বিপ্লবী লাইনের দ্বন্দ্ব বারবার দেখা দিয়েছিল

একের পাতার পর

যোগ দেয়।

কিন্তু আন্দোলনকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে গেলে যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার, আন্দোলনকে ধাপে ধাপে উন্নত করা দরকার, এবং সে জন্য প্রতিটি এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে তার অধীনে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে আন্দোলনকে সুসংগঠিত নেতৃত্বের অধীনে পরিচালনা করার দরকার ছিল, তা করা হয়নি। আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে আন্দোলনের লক্ষ্য, পরিচালন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্নে অবিভক্ত সিপিআইয়ের সাথে এস ইউ সি আইয়ের মতপার্থক্য দেখা দেয়। এস ইউ সি আই লেনিনের শিক্ষানুযায়ী পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক করেই আন্দোলনগুলি পরিচালনার চেষ্টা চালায়। এস ইউ সি আইয়ের লক্ষ্য ছিল, আন্দোলনের দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে জনগণকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ও স্বাধীন দেশের সরকার সম্পর্কে মোহমুক্ত করা, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত জনগণকে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং এইপথেই যথাসম্ভব আশু দাবিগুলি আদায় করারও চেষ্টা করা। অন্যদিকে অবিভক্ত সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএমের লক্ষ্য ছিল— জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, অন্ধ এবং অসংগঠিত রেখে কিছু বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণমূলক কর্মসূচি নেওয়া, যাতে সরকারি দলবিরোধী মানসিকতা জাগিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে অধিক ভোট ও সিট পাওয়ার জমি প্রশস্ত করা যায়। তাই 'জনসাধারণ প্রস্তুত নয়' বলে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে গড়ে তোলার জন্য এস ইউ সি আইয়ের প্রস্তাবগুলি তারা বারবার প্রত্যাখান করে। অথচ জনসাধারণের মধ্যে সেদিন উৎসাহের কোনও ঘাটতি ছিল না। লাগাতার পুলিশি দমন-পীড়ন, গ্রেফতার সত্ত্বেও ৩১ আগস্ট বিপুল সংখ্যায় মানুষ কলকাতায় এসেছিল। ৩১ আগস্টের অত্যাচারের পরদিন ১ সেপ্টেম্বর ছাত্রসংগঠনগুলি ছাত্রধর্মঘটের ডাক দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে ডি এস ও-র নেতৃত্বে বিশাল ছাত্রমিছিল বউবাজার থানার সামনে এলে পুলিশ তার উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু এত কিছুতেও সরকার জনসাধারণের মনোবল ভাঙতে পারেনি। ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে ডাকা হরতালে মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কংগ্রেস সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে গোটা কলকাতা। পুলিশ কোথাও এলাকায় ঢুকতে পারেনি। ফলে 'জনতা প্রস্তুত নয়', এ কথার দ্বারা এই সমস্ত নেতারা শুধু যে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই নয়, নিজেদের আন্দোলনবিমুখতার সমস্ত বোঝা নিশ্চিন্তে জনতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তাদের বিন্দুমাত্র বাধেনি। আসলে জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে, সংগ্রাম কমিটিগুলির মধ্যে তাদের সংগঠিত করে জনসাধারণের নিজস্ব শক্তির জন্ম দিতে তারা কখনওই চায়নি। তাই আন্দোলনের মধ্যেও তারা কখনওই দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি পেশ করেনি। জোর দিয়েছে কেবল আশু দাবিগুলির উপর, যাতে তার সামান্য সাফল্যও নির্বাচনী প্রচারের কাজে লাগানো যায়। তেমনই খাদ্য সংকট সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির জন্যও তারা শুধুমাত্র সরকারকেই, বড়জোর তার অনুসৃত নীতিকেই দায়ী করেছে। কখনওই সমস্ত সমস্যার মূল যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, তাকে দায়ী করেনি। তাই এস ইউ সি আই যখন দাবি করেছিল আন্দোলনের দাবিগুলি না মানলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং কমিটিও তাতে সহমত হয়েছিল, তখন সিপিআই নেতারা শুধুমাত্র খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকেই সামনে নিয়ে আসেন। আসলে আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা এমন কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাননি যাতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি, তার আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা গড়ে ওঠে বা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ সব তাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল না; অভাব-অভিযোগকে ভিত্তি করে জনসাধারণের মধ্যে সরকার বিরোধী যে ক্ষোভ, তাকে ভোটের বাক্সে নিয়ে গিয়ে ফেলাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এবং মানসচক্ষে তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের এই উদ্দেশ্য সফল হতে যাচ্ছে। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার আইন-শৃঙ্খলার প্রতি তাঁদের আনুগত্য দেখানো এবং 'দায়িত্বশীল বিরোধী দল' হিসাবে নিজেদের তুলে ধরাও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

'৫৯ সালের ৩১ আগস্ট। পুলিশ শুধু লাঠিপেটা করেই অসংখ্য আন্দোলনকারীকে হত্যা করেছিল।

গণআন্দোলন সম্পর্কে এই দুই লাইনের পার্থক্য আন্দোলনে বারবার তীব্র হয়ে দেখা দেয়। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি মূলত অবিভক্ত সিপিআইকেই সমর্থন জানায়। কিন্তু এস ইউ সি আইয়ের একক সাংগঠনিক শক্তি সেদিন এমন ছিল না যার মাধ্যমে এককভাবে গোটা আন্দোলনকে সংগ্রামী লাইনে পরিচালনা করা যায়। এই অবস্থায় অন্য দলগুলির সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই সিপিআই নেতারা বন্দিমুক্তির শর্তে যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন, এস ইউ সি আই তার তীব্র সমালোচনা করে। ফলে বামপন্থী আন্দোলনের অনেক শক্তি ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, অনেক অত্যাচার, মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সিপিআই নেতৃত্বের আপসমুখী ভূমিকার জন্য আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি, দাবিগুলি অপূরিত থেকে যায়। অথচ শহিদ স্মরণে সেদিনও সিপিআই নেতাদের আড়ম্বর ছিল লক্ষণীয়। আমরা সে সময়ই বলেছিলাম, "যে কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বল নেতৃত্ব অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি, যে পার্টি আন্দোলনের সাথে থেকেও তার রাশ টেনে ধরেছে, সেই পার্টি আজ এমন তারস্বরে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, হঠাৎ করে তাদের সত্যিকারের ভূমিকা বুঝতে যথার্থই বেগ পেতে হয়। কংগ্রেস সরকারের বর্বরতার নিন্দাবাদে তাদের সমকক্ষ আজ আর কেউ নেই। শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আড়ম্বরে আর সবাই পরাজয় স্বীকার করেছে।" (গণদাবী, নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৯)।

'৫৯-এর আন্দোলনে নেতৃত্বের এই বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও '৬৬ সালে আবার খাদ্যের দাবিতে এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। শহিদ হন নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত। সর্বত্র পুলিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। জায়গায় জায়গায় জনতা থানা দখল করে নেয়, রেললাইন আটকে দেয়। এই আন্দোলন আর একটা সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। যদি সঠিক নেতৃত্বে সঠিক লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করা যেত তবে দাবি আদায় করা সম্ভব হত। কিন্তু সিপিএমের মতো একটি মেকি বামপন্থী শক্তি, ক্ষমতালোলুপ দল নেতৃত্বে থাকায় তা আবারও ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই আন্দোলনগুলিকে ভিত্তি করেই রাজ্যজুড়ে তীব্র কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তারই ফল হিসাবে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সিপিএম এবং সিপিআইকে কেন্দ্র করে দুটি পৃথক জোট হলেও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস পরাজিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। গণআন্দোলন সম্পর্কে এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা নিয়েও এস ইউ সি আইয়ের সঙ্গে অন্যান্য দলের তীব্র মতপার্থক্য হয়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের চক্রান্তে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে ঐ সরকারকে ফেলে দেওয়া হলেও '৬৯ সালে আবার বিপুলতর জনসমর্থন নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ফিরে আসে। দ্বিতীয় দফার যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও সিপিএম একদলীয় শাসন কায়েম করতে চেয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙনের দিকে ঠেলে দেয়। তাদের এই হীন রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পুনরুত্থানের জমি তৈরি করে দেয়। এরপরই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সিপিএমের বোঝাপড়া এতদূর যায় যে, উত্তরপ্রদেশ-বিহার প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেসের অত্যাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন সর্বভারতীয় তাৎপর্য নিয়ে গড়ে ওঠে এবং যাতে এস ইউ সি আই যোগ দিয়েছিল, তাতে জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী শক্তি রয়েছে— এই অজুহাত তুলে সিপিএম নেতৃত্ব যোগ দিতে অস্বীকার করে। আমরা তাদের এই আন্দোলন বিরোধী ভূমিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেখাই যে, ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার জন্যই তারা জয়প্রকাশের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে না এবং এর দ্বারা তারা গোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির হাতে চলে যেতেই সাহায্য করছে। আমাদের এই সমালোচনায় সিপিএম নেতৃত্ব ক্ষিপ্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে নয় পার্টির মোর্চায় যে ঐক্য ছিল তা ভেঙে দেয়। অথচ '৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে নিয়ে যে জনতা পার্টির জন্ম হয়, মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিপিএম তার সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলে এবং নির্বাচনে জিতে জনতা পার্টি কেন্দ্রের সরকারে বসলে সেই সরকারকে 'বন্ধু সরকার' বলে সিপিএম অভিহিত করে। ঘটনা হল, বিহার আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রের সরকারে বসার মধ্য দিয়ে জনসংঘ (বর্তমানে বিজেপি) তার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে ভি পি সিংকে মাঝখানে রেখে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকেও সমর্থনে সিপিএম পিছুপা হয়নি। এভাবেই তারা বামপন্থী গণআন্দোলনকে দুর্বল করে দেশে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির উত্থানে কার্যত সাহায্য করেছে।

'৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা মার খাওয়ায় রাতারাতি 'বামফ্রন্ট' নামে একটা জোট গঠন করে সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি ভোটের লড়াইয়ে নামে। ভোটপ্রচারে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর দ্বিতীয় বেতার ভাষণে বলেছিলেন, 'বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে এবার আর আন্দোলন-অশান্তি হবে না। আগে এসব হয়েছিল, তার জন্য দায়ী এস ইউ সি আই। এবার তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।' ক্ষমতায় এসে পুঁজিপতিদের উদ্দেশে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি ৩২ বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সিপিএম। অথচ রাজ্যের শোষিত-নিপীড়িত অসচেতন মানুষ আশা করেছিল, পূর্বেকার রক্তক্ষয়ী যে গণআন্দোলনকে পুঁজি করেই সিপিএম ক্ষমতায় বসেছে, গণআন্দোলনের সেই দাবিগুলি তারা কার্যকর করবে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবর ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকে মর্যাদা দেবে। মানুষের এই আশার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সিপিএম।

ভুল ভাঙতে মানুষের দেরি হয়নি। কংগ্রেস সরকারের মতোই একই নীতি এবং পদ্ধতি নিয়ে সরকার চালাতে শুরু করল বামফ্রন্ট নামধারী এই সরকারটিও। কালোবাজারি-মজুতদারদের দাপট অটুট থাকল। দুর্নীতি ধীরে ধীরে কংগ্রেস আমলকেও ছাড়িয়ে গেল। নিত্যপ্রয়োজনীয়

আটের পাতায় দেখুন

আমরা সে সময়ই বলেছিলাম, "যে কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বল নেতৃত্ব অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি, যে পার্টি আন্দোলনের সাথে থেকেও তার রাশ টেনে ধরেছে, সেই পার্টি আজ এমন তারস্বরে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, হঠাৎ করে তাদের সত্যিকারের ভূমিকা বুঝতে যথার্থই বেগ পেতে হয়। কংগ্রেস সরকারের বর্বরতার নিন্দাবাদে তাদের সমকক্ষ আজ আর কেউ নেই। শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আড়ম্বরে আর সবাই পরাজয় স্বীকার করেছে।" (গণদাবী, নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৯)।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

৩১ আগস্টের উত্তরাধিকার আজ বামপন্থী ধারায় গণআন্দোলনকারীরাই বহন করছে

সাতের পাতার পর

জিনিসের দাম অবাধে বাড়তে থাকল, পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি ঘটতে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে। সংগ্রামের যে ঐতিহ্যকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা আতঙ্কের চোখে দেখত, যে সংগ্রামী আগুনকে কংগ্রেস কখনও নেভাতে পারেনি, তাকেই স্তব্ধ করার উদ্যোগ নিল সিপিএম। একদিকে সংগ্রামী চরিত্রকে ধ্বংস করতে থাকল, অপরদিকে যেখানেই আন্দোলন-প্রতিবাদ গড়ে উঠল তার উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন নামিয়ে আনল। এ কাজে তারা কংগ্রেসকেও ছাড়িয়ে গেল। এস ইউ সি আই কিন্তু বরাবরের মতো গণআন্দোলনের রাজনীতিকেই পাথেয় করে চলেছে।

'৫৯ সালে যে রাজভবনের সামনের রাজপথ কংগ্রেস সরকারের পুলিশের লাঠি-গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল, '৭৯ সালের ১৫ জুন ঠিক সেখানেই কর ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন ও বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ আইনঅমান্যকারীদের উপর সিপিএম সরকারের পুলিশ নির্মম অত্যাচার চালাল। আহত হলেন পাঁচ শতাধিক মানুষ, এস ইউ সি আই-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত সহ গুরুতর আহত হলেন প্রায় ২০০ জন। '৭৯-র এই ১৫ জুন থেকেই পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের আর একটি অধ্যায় শুরু হল।

একের পর এক ঘটনায় সিপিএম সরকারের জনবিরোধী চরিত্র উন্মোচিত হতে থাকল। '৭৯ সালের ৩১ জুন মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশকে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে কমপক্ষে ৩০ জনকে হত্যা করাল সিপিএম। ৩ অক্টোবর ৭ জন বন্দর শ্রমিক নিহত হল পুলিশের গুলিতে। '৮০ সালে ৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ির চা-বাগানে পুলিশ গুলি চালিয়ে এক জন চা-শ্রমিককে হত্যা করল। '৮১ সালে উত্তর দিনাজপুরে পাটচাষিদের উপর গুলি চলল, দু'জন চাষি নিহত হল। '৮২ সালে নন্দীগ্রামে উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভরত জনতার উপর গুলি চালিয়ে ২৫ মার্চ এক শিশুকে এবং ১৬ নভেম্বর সুদীপ্ত তেওয়ারি নামে এক ছাত্রকে হত্যা করা হল। '৮৩ সালে এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে মানিকতলায় এক যুবককে এবং পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে কমরেড শোভারাম মোদক ও কমরেড হাবুল রজককে হত্যা করল পুলিশ। '৮৭ সালে পুরুলিয়ার নেতুরিয়ায় এস ইউ সি আইয়ের মিছিলে গুলি চালিয়ে পুলিশ দু'জনকে হত্যা করল। '৮৮ সালে শান্তিপুরে বিদ্যুতের দাবি করে পুলিশের গুলিতে নিহত হল ২ জন কৃষক।

'৯০ সালে পরিবহণের ব্যাপক ভাড়াবৃদ্ধি ঘটায় সিপিএম সরকার। মূল্যবৃদ্ধিও সীমা ছাড়ায়। জনমনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট বহির্ভূত আরও কিছু বামপন্থী দল যুক্তভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিক্ষোভ-অবরোধের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে আন্দোলন বৃহত্তর আকার নিতে থাকে। ৩১ আগস্ট শহিদ দিবসে আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়। সেদিন যেন আবার ফিরে এসেছিল '৫৯ সালের ৩১ আগস্ট। হাজার কণ্ঠে সেদিনের দাবিগুলিই উচ্চারিত হচ্ছিল। আওয়াজ উঠেছিল পরিবহণের ভাড়া কমাও, খাদ্যদ্রব্যের দাম কমাও, কালোবাজারিদের গ্রেফতার কর প্রভৃতি। '৫৯ সালে ক্ষমতায় ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, আর '৯০ সালে ক্ষমতায় সিপিএম ও সহযোগীরা। দলের নামে পার্থক্য থাকলেও শাসকের চরিত্রে ফারাক হয়নি। কংগ্রেসী কায়দাতেই সিপিএম সরকারও সেদিন দাবি মানার পরিবর্তে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশই দিয়েছিল। নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল ধর্মতলার রাজপথ। শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিল ১৮ বছরের যুবক, এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড মাধাই হালদার। গুলিবিদ্ধ হয়েছিল আরও ৩২ জন এস ইউ সি আই কর্মী। তাঁদের মধ্যে বহু জন আজও পঙ্গু অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সেদিন ধর্মতলাতেই পাশের আর এক 'শহিদ স্মরণ' সভায় বক্তব্য রাখছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। গুলি চালনার ঘটনা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করে দেওয়া হল।' এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে সেদিন প্রবল ধিক্কার উঠেছিল। ৩ সেপ্টেম্বর পালিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা বনধ।

সিপিএম সরকারের জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনে পুলিশ এবং

'৯০ সালে মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে শহিদ এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড মাধাই হালদার

সিপিএম ঘাতক বাহিনীর হাতে এস ইউ সি আইয়ের ১৫১ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। মিথ্যা মামলায় ৪৯ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ১০৮ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মার্ডার কেস ঝুলছে। ৮০০ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে। শুধু পুলিশ নয়, আন্দোলন ভাঙার কাজে সিপিএম ক্রিমিনালদেরও বহুবার ব্যবহার করেছে। কিন্তু নন্দীগ্রামের জমিরক্ষার আন্দোলনে গণহত্যা ঘটানো ছাড়াও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ক্রিমিনালদের দিয়ে গণধর্ষণ করায় সিপিএম, যা এমনকী ব্রিটিশ সরকারও করতে পারেনি। তখনই এস ইউ সি আই ঘোষণা করে, গণআন্দোলনকে সিপিএমের ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনেই গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করা জরুরি। কিন্তু কোনও বামপন্থী দলই এই উদ্যোগে সাড়া দেয়নি। এই পটভূমিতেই গণআন্দোলনের প্রয়োজনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এস ইউ সি আইয়ের রাজ্যভিত্তিক ঐক্য গড়ে ওঠে— যে ঐক্যের পটভূমি সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে যৌথ আন্দোলন তৈরি করে দিয়েছিল।

জনগণের প্রতি, গণআন্দোলনের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বহন করেই সিপিএম আজ '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে শহিদ স্মরণের ডাক দিচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে!

এ রাজ্যে সিপিএম শাসন একটানা ৩২ বছর অতিক্রম করেছে, যা এ রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের সময়কালেরও বেশি। কংগ্রেস শাসনে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবরা যে দাবি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল, আজ কি সেই দাবিগুলি আর নেই? তা যদি না থাকবে, তা হলে, আজও কেন রাজ্যে সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ীই ৪৬১২টি গ্রামে বছরের একটা দীর্ঘ সময় অনাহারের পরিস্থিতি বিরাজ করে? কেন সন্তানকে খেতে দিতে না পেরে মা সন্তান সহ আত্মহত্যা করেন? কেন কালোবাজারি-মজুতদারদের উপর সরকারের এতটুকুও নিয়ন্ত্রণ নেই? কেন চাল, আলু, সবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস নিয়েই বিনা বাধায় ব্যাপক কালোবাজারি চলতে পারছে? এ সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সিপিএমের কী অধিকার রয়েছে শহিদদের স্মরণ করার? যারা ক্ষমতায় বসে অসংখ্যবার গুলি চালিয়ে শত শত শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে শহিদ করে, তাদের প্রতিবাদী আন্দোলনকে লাঠি-গুলি চালিয়ে স্তব্ধ করতে চায়, নন্দীগ্রামে কৃষক ও খেতমজুরদের হত্যা করে, আন্দোলনকারী মহিলাদের ধর্ষণ করায়, সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে পুড়িয়ে মারে, লালগড়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়, তাদের কোনও অধিকারই নেই খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করার। তাদের রক্তাক্ত হাত শহিদদের মালা দিলে শহিদদের প্রতি তার চেয়ে উদ্দেশ্যই নয়। একদিন পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের শহিদদের আত্মদানকে পুঁজি করেই যারা সরকারি ক্ষমতায় বসেছে, আজ তারা ভরাডুবির আতঙ্কে আবার গণআন্দোলনের শহিদ স্মরণের আড়ম্বর করে পায়ের তলার মাটি ফিরে পেতে চাইছে।

এ প্রশ্ন আজ উঠতে বাধ্য যে, বামপন্থী খাদ্য আন্দোলনের যথার্থ উত্তরাধিকার কারা বহন করছে? যারা শাসকের আসনে বসে ৩২ বছর ধরে সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, নাকি যারা রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে বামপন্থী গণআন্দোলনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে?

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

ছয়ের পাতার পর

যাতে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের যোগ্য ছাত্র হয়ে উঠি। পার্টি কংগ্রেস হতে যাচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতবড় সঙ্কট বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, নজরুলরা দেখে যাননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে ভয়ঙ্কর সংকট আসছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আজ আমরা তার সম্মুখীন হয়েছি। গোটা বিশ্বে বুর্জোয়া বাজার অর্থনীতি চলছে অথচ বাজার ভেঙে তছনছ। সর্বোচ্চ শোষণ লুণ্ঠন চলছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। তার উপর দেশে-বিদেশে কোটি কোটি ছাঁটাই হচ্ছে, কোটি কোটি বেকার ঘুরছে। মানুষ মরছে, আত্মহত্যা করছে, পাগল হয়ে যাচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম শ্মশান, কোথায় কে যাচ্ছে, কেউ জানে না। দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ মেয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কোনও নির্বাচন, কোনও মন্ত্রী বদল, সরকার বদলের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না। এ সমাজ, অর্থনীতি পচে গেছে, ফলে একে পাল্টাতে হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও নবজাগরণের যুগের মূল্যবোধ নেই, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই। রাজনীতির নেতারা মিথ্যাচারী, ব্যাভিচারী, ভণ্ড, কপট। তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, কায়েম করছে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদ। কথায় কথায় লাঠি-গুলি চলছে। শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। সমাজে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-মায়া-মমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ দেশে কোর্ট রায় দিয়েছে সমকামিতা আইনসম্মত, বৈধ। লিভিং টুগেদার, অর্থাৎ অবিবাহিত নারী-পুরুষের একসাথে থাকা বৈধ। দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য সেক্স এডুকেশন চালু করা হয়েছে। এসব জিনিস আমাদের বাবা-ঠাকুরদারা ভাবতে পেরেছিলেন? বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলরা কি ভাবতে পেরেছিলেন, প্রগতির নামে এসব ঘটবে? ইউরোপে শেক্সপীয়ার, রুশো, মিল, ভলতেয়ার, ফুয়েরবাখ কি কখনও এ জিনিস ভেবেছিলেন? দুনিয়া জুড়ে আজ এই অবস্থা। অনেকে মনে করেন, টাকা পেলেই শান্তি। অথচ কোটি কোটি টাকার মালিক, মদ ছাড়া তাদের দিন চলে না, ট্যাবলেট না খেলে তাদের ঘুম হয় না। ব্রিটেনে সরকার বলছে, বারো বছরের ছেলেদের কন্ট্রাসেপটিভ দিতে হবে, যাতে অবৈধ সন্তান না হয়। আমেরিকাতে স্কুল-কলেজে অ্যাবরশনের জন্য ক্লিনিক খুলে দিচ্ছে। ফলে সব দিক থেকেই সমাজ আজ মুক্তিবেদনায় ছটফট করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, শ্রমিক-কৃষক-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব গমকে গমকে আসতে চাইছে, বার বার ফুলে ফুলে উঠে মানুষের বিবেকের কাছে, আমাদের কাছে বলতে চাইছে, পরিবর্তন চাই। আমরা সাড়া দেব কি? তিনি বলেছিলেন, এ সমাজের আর কিছু দেওয়ার নেই। আগামী দিনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদের অবসান ঘটাবার জন্য বিপ্লব চাই। তার জমি, গোলা-বারুদ প্রস্তুত। চাই আদর্শ, নৈতিকতা, সংগঠনগত দিক থেকে উপযুক্ত দল। আদর্শ, নৈতিকতা আছে নেতা-কর্মীদের সম্মুখে। চাই তার ভিত্তিতে সংগ্রামে রত উন্নত মানের নেতা-কর্মী। চাই সুসংহত, শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল সংগঠন। উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান রেখেছিলেন, আপানারা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কর্মবিমুখ না হয়ে দিবারাত্রি, যে যেমন পারেন, যার যার বুদ্ধি নিয়ে, নেতৃত্ব দায়িত্ব দিক বা না দিক, নিজের উদ্যোগে কাজ সৃষ্টি করুন, কাজ করুন, সংগঠন গড়ে তুলুন। মানুষের কাছে রাজনীতি নিয়ে যান, সংস্কৃতি নিয়ে যান। যাতে আমরা দ্রুত এই অবস্থাটা পাল্টাতে পারি।

আজ কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের যে ডাক দিয়েছেন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা লড়ব। আগামী কাল থেকে আমাদের নতুন সংগ্রাম শুরু হবে। এই প্রতিজ্ঞা নিতে আপনারা প্রস্তুত কি? আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, হ্যাঁ কি না বলুন? (উপস্থিত কমরেডরা সমস্বরে হ্যাঁ বলেন)। এ যদি পারেন তবেই কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। এ কথা বলেই আমি আজ শেষ করছি।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য নিয়ে ইরানের লেবার পার্টির সঙ্গে কমরেড মানিক মুখার্জীর আলোচনা

১৮-২৩ জুলাই এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী জার্মানি সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে ফ্রাঙ্কফুর্টে তিনি ইরানের লেবার পার্টির নেতা বিজান কালেনটারিয়ান সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নানা বিষয়ে, বিশেষত ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের অভিমত নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। ইরানের কিছু গোষ্ঠীকে মদত দেওয়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ইরানের আভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা চালাচ্ছে, সে বিষয়ে ইরানের পার্টি এবং এস ইউ সি আই একমত হয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রশ্নে, বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টদের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও তাঁরা একমত হন — যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১১-১৭ নভেম্বর দিল্লিতে এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়ার জন্য কমরেড মুখার্জী ইরানের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। নেতৃবৃন্দ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in